KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৫ শেতলাতলা লেন, ইমামবাড়া, কল-৬০
Collection : KLMLGK	Publisher সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
Title অন্তরীপ (Antareep)	Size 8.5"/5.5"
Vol & Number ? (Annual No) ? (Annual No) ? (Annual No) ? (Annual No)	Year of Publication : NOV 1992 OCt 1993 Jun 1994 Jun 1997
	Condition : Brittle Good ✓
Editor সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়	Remarks

C.D. Roll No : KLMLGK

ডিজিটাল ডিজিটাল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

অন্তরীপ
জুন ১৯৯৪

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯ *

সন্দীপ দত্ত
লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
সৌজন্যে, আন্তরিকতায়,
সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
১৪.৮.৯৪.

অন্তরীপ

জুন ১৯৯৪

ক্রম

১-৮ প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত : তৃষিত ময়ূরের আত্মনিবেদন জহর সেনমজুমদার

৯-১৪ প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের একটি কবিতা : 'এখন দুঃখের ডানা'
সুজিত সরকার

১৫-২১ 'কয়েকজন কুমোরের কাহিনী' : প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

২২-৩৪ 'শুদ্ধ পাতার দিকে ঝুঁকে পড়ি একা' : প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের পাঁচটি কবিতা
সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

৩৫ প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের দুটি কবিতা

৩৬-৫৮ মরিস কারেমের কবিতা : ভূমিকা ও ভাষান্তর নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

৫৯-৭১ তাদেউশ রুজেভিচ-এর কবিতা : ভাষ্য ও ভাষান্তর ভাস্কর চক্রবর্তী

৭২-৭৪ কয়েকটি নক্ষত্র ও অসম্ভব উৎপলকুমার সুমন গুণ

৭৫-৮০ সমগ্র রুচি, কবিতার ঘ্রাণ প্রবুদ্ধ বাগচী

৮১-৯৭ সময়ের প্রতিচ্ছবি : শঙ্খ ঘোষের সাম্প্রতিক কবিতা বাসবী চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ কৃষ্ণেন্দু চাকী

সম্পাদনা সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

অন্তরীপ ৫ খেলাত বাবু লেন টালাপার্ক কলকাতা ৩৭

মুদ্রক সোম প্রিণ্টার্স ৭ কানাইলাল চ্যাটার্জী স্ট্রিট কলকাতা ৭৬

দশ টাকা

প্রসঙ্গত

পঞ্চাশের আত্মমগ্ন সংবেদী কবি প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের কবিতাকৃতি নিয়ে এবারের 'অন্তরীপ', তার সূচনাপর্ব। চারটি নিবন্ধের সূত্রে তুলে ধরা হল তাঁর স্বাতন্ত্র্য, স্বকীয় উচ্চারণভঙ্গি, কবিতাকারুর নানান্ দিক, জীবনবোধ আর নৈঃশব্দে নিবেদিত তাঁর অনুভবের অন্তর্মেজাজ। একক কবিতাবিশ্লেষে এবং সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে তাঁকে আমাদের কবিতার সংসারে শনাক্ত করবার জন্য 'অন্তরীপ'-এর তরফে এই সামান্য প্রয়াস।

দীর্ঘ ভূমিকাসমেত অনূদিত হলেন বেলজিয়ামের প্রতিভূ কবি মরিস কারেম। ২৫টি কবিতার অনন্য তর্জমায় উদ্ঘাটিত হল তাঁর কবিতার আপাতসারল্য, প্রতীকী মেজাজ, শিশু-অনুষঙ্গ আর রবীন্দ্রানুরাগ। যুদ্ধোত্তর পোলিশ কবিতার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার তাদেউশ রুজেভিচ-এর ১৬টি অনুবাদে উন্মোচিত হল তাঁর প্রথাবিরোধী, খোলামেলা, রহস্যহীন উচ্চারণের আশ্চর্য নমুনা। ভাষান্তরিত দুই কবি কুশলী উপস্থাপনার গুণে আমাদের কবিতাকেও ঋদ্ধ করবে, এই বিশ্বাস রইল।

এ ছাড়া, এ সংখ্যায় অল্পায়তনে আলোচিত হলেন পঞ্চাশের বিশিষ্ট কবি উৎপল কুমার বসু। শঙ্খ ঘোষের বহুপঠিত একটি প্রবন্ধের সূত্র ধরে তার অভিঘাত ব্যক্ত করলেন এই সময়ের এক প্রতিশ্রুতিবান প্রাবন্ধিক। আর তাঁরই সাম্প্রতিক 'লাইনেই ছিলাম বাবা' এবং 'গান্ধর্ব' কবিতাগুচ্ছ'-কে অন্তর্ভুক্ত করে সামগ্রিক প্রেক্ষিতে এক দীর্ঘ মূল্যায়ন পরিবেষিত হল এই সংখ্যার শেষ লেখায়।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের দুটি কবিতা এবং অনূদিত গুচ্ছকবিতা ছাড়া এবারের নিবেদনে রইল না আর কোনও স্বতন্ত্র কবিতার আয়োজন। কিন্তু আগামী সংখ্যায় কবিতার জন্য হাত বাড়ানোই রইল 'অন্তরীপ'-এর।

শুভেচ্ছায়, প্রীতিবিনিময়ে,

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত : তৃষিত ময়ূরের আত্মনিবেদন

জহর সেনমজুমদার

১

সমসাময়িক জগৎ ও জীবনে ক্রমাগত তৈরি হয়ে উঠছে অস্থির বুদবুদ। জীবন স্থায়ী নয়। বুদবুদও মিলিয়ে যায়। কিন্তু অজস্র বুদবুদের এই গড়ে ওঠা এবং দ্রুত ভেঙে ভেঙে পড়া—যাকে নিয়ে জীবনের দৃশ্যকল্পনা বা সর্বার্থে জীবন-কল্পনার জন্ম হয়। এইসব চঞ্চল বুদবুদগুলোকে খুব মনোযোগসহকারে ধীরস্থিরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন যে কবি, তাঁর নামই প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত। সব-সময়ের সকলের থেকে আলাদা, নিজস্ব মগ্নচৈতন্যের আবহে রাখেন ইন্দ্রিয়গাঢ় জগৎ এবং ক্রমে ইন্দ্রিয়চালনা করেন এমন এক মহাজগতে, যেখানে সবটাই যেমন আলো নয় তেমনই সবটা অন্ধকারও নয়। আলোআঁধারে মেশানো একটি জীবনকে বড়ো করে তোলার সবুজ সংকেত। তাই তাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলোর মধ্যে ছড়ানো রয়েছে একটা সাইকেল, যার চাকায় গেঁথে আছে হলুদ পাতা। আমরা এই দুটিকে অবশ্যই প্রতীক ভেবে নিতে পারি। অর্থাৎ

সাইকেল = চলমান জীবন
হলুদপাতা = প্রাণ বা দৃশ্যকল্পনা

এই দুটি নিঃশব্দ মন্থনকারী প্রতীক যে কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা থেকে উঠে এসে আমাদের স্তব্ধ ও প্রণম্য করে, সেই কাব্যগ্রন্থের নাম—'এখন গুজব নেই।' ১৯৯১ সালে প্রকাশিত। 'এক ঋতু' থেকে শুরু করে 'নিঃশব্দ শিকড়' পর্যন্ত তিনি জগৎরঙের জগৎপ্রাণের শুদ্ধ আবিষ্কারক। এই পর্যায় শেষ। 'এখন গুজব নেই' এবং পরবর্তী 'বাধা পেরোনোর গান' (১৯৯৪) কাব্যগ্রন্থদ্বয়ের নতুন পর্যায়ে তিনি আর আবিষ্কারক নন। বরং মানুষ ও রাস্তার মেলবন্ধনকারী, জীবন ও মৃত্যুর সংযোগকারী, জগৎ এবং মহাজগতের মধ্যবর্তী সাঁকোর ভূমিকাবহনকারী। কিছুতেই তিনি আর শান্ত থাকতে পারছেন না। ধীর স্থির থাকতে পারছেন না। একটু অশান্ত, একটু চঞ্চল হয়ে তিনি জীবনকে স্পর্শ করে বুঝতে পারলেন পরিবর্তিত আবহমণ্ডল। দেখলেন মোচড়ানো জীবন। দোমড়ানো জগৎ। আর ভয়ংকর প্রেমহীনতা। প্রণবেন্দু দাশগুপ্তর পূর্ববর্তী কবিতায় এতো মর্মান্তিক প্রেমহীনতার দেখা আমরা নিশ্চয়ই পাইনি। এই দ্বিতীয় বা মধ্যপর্যায়ে এসে তিনি দেখলেন জীবন এবং অপ্রেমের ঘনিষ্ঠতা। অভ্যন্তরে প্রেম আছে; কিন্তু সে প্রেম কিছুতেই যেনবা জীবনের সঙ্গে এসে

মিলতে পারছে না। আরো স্পষ্ট করে বলা যাক। তিনি দেখালেন বিভিন্ন দৃশ্যের মাধ্যমে, বিভিন্ন মুহূর্তের মাধ্যমে, বিভিন্ন অনুষঙ্গের মাধ্যমে, বিভিন্ন মাঠ ও রোদের মাধ্যমে প্রেম আসছে। কিন্তু সেই প্রেম হঠাৎই ছিঁড়ে যাচ্ছে ছেঁড়া মাস্তুলের মতো। ফলত এই চেতনাস্তরে দাঁড়িয়ে 'এখন গুজব নেই' কাব্যগ্রন্থে তিনি দেখালেন অপ্রেম বা প্রেমহীনতার তৃষিত ময়ূরকে। দেখালেন বালকের পায়ের আঘাত থেকে ছিট্‌কে আসা লাল বলকে, যে লাল বল আসলে আমাদের চলমান হৃদপিণ্ডের প্রচণ্ড গতিবেগ। এই লাল বলের মধ্যে দিয়ে চলন্ত প্রেম বা তৃষ্ণা জীবনকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে! কিন্তু আঁকড়ে ধরা সম্ভব হচ্ছে কই? কেননা, আমরা সবাই তো এক-একজন তৃষিত ময়ূর। বনের মধ্যে কর্কশ শব্দ তুলে ঘুরে মরি। কিছু একটা খুঁজি। প্রণবেন্দু 'মাঝরাস্তার কবিতা'-য় এইসব তৃষিত ময়ূরদের অন্যতম ময়ূর হয়েই প্রশ্ন তুলেছেন; 'আমরা সবাই কার খোঁজ করি?' উত্তর আধুনিক যন্ত্রণাযুগে আমরা সবাই যা জানি, তা হলো: লাল বলের পেছন পেছন গিয়ে প্রেমময় আস্বাদ ও আস্বাদ্য হয়ে উঠতে চাই। কিন্তু পারি না। আর পারি না বলেই প্রণবেন্দু লেখেন প্রতিটি সংশয়ের কথা, প্রতিটি মানবতাড়িত স্পন্দনের কথা, প্রতিটি অমোঘ দৃষ্টিকোণের কথা। এক আশ্চর্য বাঁকবদলের বাস্তবে দাঁড়িয়ে তিনি জিয়ল গাছের মধ্য থেকে আঠা গড়িয়ে নামতে দেখেন। 'ছেঁড়া নকশা জুড়ে দাও' কবিতাটি দ্রষ্টব্য। জিয়ল নামক আঠা গাছ আসলে যে সমকালীন এই জীবন, তা কতো অনায়াসে বুঝিয়ে দেন তিনি। প্রার্থনা করেন—'ছেঁড়া নকশা জুড়ে দাও, ভাঙা ঘর, বিচ্ছিন্ন সময়'।

প্রণবেন্দু-র এই প্রার্থনা কোনো ঈশ্বরের কাছে নয়। এই প্রার্থনা ঈর্ষা-ঘৃণা-রাগ-কুচকাওয়াজ ইত্যাদি অতিক্রমী প্রেমময় জীবনের কাছে। প্রশ্ন ওঠে। মানুষই কি তার প্রেমহীন জীর্ণ অস্তিত্বের চাপ ভেদ করে জীবনার্থ-অন্বেষণে জীবনের কাছে যাবে? নাকি জীবনই স্বয়ং এগিয়ে এসে মানুষ ও হৃদয়ের শুশ্রূষার দায়িত্ব নেবে? আমাদের এই প্রাত্যহিক জীর্ণ অস্তিত্বের পাশে প্রণবেন্দু যখন নিয়ে আসেন পিয়ানো (দ্রষ্টব্য 'স্ট্রাউসের ঢেউ' কিংবা 'ঋণশোধ' কবিতাদ্বয়), নিয়ে আসেন গীটার (দ্রষ্টব্য 'ছন্দ' কবিতাটি), নিয়ে আসেন উচ্ছল ছাত্র-ছাত্রীদের ক্যাম্পাসকলরোল (দ্রষ্টব্য 'ছাত্রছাত্রী' কবিতাটি), নিয়ে আসেন রেডিওভর্তি রবীন্দ্রসঙ্গীত ('পাগল পৃথিবী'), নিয়ে আসেন পৃথিবীময় বেজে ওঠা বাঁশি ('প্রেম'), নিয়ে আসেন লামার পার্ক ও সিমলার নিভৃত ইচ্ছাস্বপ্ন ('লামার পার্ক, আসানসোল' ও 'সিমলা' কবিতাদ্বয়)—তখন আমরাও আমাদের জীর্ণতা বা শীর্ণতার খোলস ছেড়ে দ্রুত মানুষশাসিত এই পৃথিবীর সর্বত্র এক উজ্জ্বল আলোর চিলপুরুষ হয়ে যাই। প্রণবেন্দু বুঝিয়ে দেন আমরা আসলে কেউ জীর্ণ নই,

আমরা সকলেই এক একটা জীবনানন্দের চিলপুরুষ, অপেক্ষা করছি চিল-প্রেমিকাকে পাবার জন্য। রঙিন দরজা খুলে এই চিল-প্রেমিকাকে নিঃসঙ্গ মুহূর্ত-ভরাটে আমন্ত্রণ জানাবো বলেই আমরা গীটার বা পিয়ানোয় চঞ্চল আঙুল রাখছি। 'প্রেম' ও 'চিলপুরুষ' কবিতাদুটি পরস্পর পরিপূরক। এই কবিতাদুটি পড়বার পরই পাঠক হিসেবে পড়া উচিত 'মাঝরাস্তার কবিতা' এবং 'জোড়া ময়ূর' কবিতাদুটি।

মূলত এই চারটি কবিতা 'এখন গুজব নেই' কাব্যগ্রন্থের চারটি খুঁটি এবং পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। প্রণবেন্দু এবং আমরা তৃষিত ময়ূর হয়ে এই পৃথিবীর রাস্তায় উদ্‌ভ্রান্ত। কিন্তু 'জোড়া ময়ূর' কবিতায় তৃষ্ণা নেই, উদ্‌ভ্রান্তি নেই, আছে জীবনের প্রতি গভীর আস্থা। তিনি এই আস্থা থেকেই লিখতে পারেন—'জীবন এইভাবেই যাবে, জোড়া ময়ূর।' সুতরাং চিলপুরুষের প্রেমার্তি কিংবা তৃষিত ময়ূরের চলন্ত ছবির মধ্য দিয়ে যে কবিসত্তা আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সে কবিসত্তা প্রেমহীনতার বেদনামন্থনের পর্ব পর্বান্তরে প্রেমপ্রত্যাশী বলেই ঘুমন্ত শরীর নিয়েও গরম জামার নিচে কেঁপে কেঁপে ওঠে। এই কেঁপে ওঠা কি বেদনার দংশনজাত? নাকি নিজের ব্যক্তিগত সত্তাকে সর্বময় চৈতন্যে প্রবেশ করিয়ে দেবার তুমুল তাড়না? প্রেমহীন বলেই তিনি টের পান বোকা দীননাথের অস্তিত্ব। প্রেমপ্রত্যাশী বলেই তিনি অনুভব করেন চন্দনবনে বসে থাকা পাগল বালকের পাতা নড়ে উঠবার মতো নড়ে ওঠা অস্তিত্বময়তাকে। উড়ো ছাইয়ের সঙ্গে কথা বলেন যে কবি, ব্রীজ পেরোনো ট্রেনের দিকে তাকিয়ে থাকেন যে কবি, পুরোনো ঘরের ছড়ানো ভাঙা ছালবাকল আমূলবিদ্ধ করে যে কবিকে—তিনি তো স্পষ্টই দেখতে পাবেন দিগন্ত অবধি জীবনের তরুলতা জীবনেরই মৃগমাংসকে। পাগল পৃথিবীর অন্যতম সদস্য হয়েই তিনি ভেতরে ভেতরে বোঝেন—'বোবা একটা ব্যথা যেন গড়িয়ে যাচ্ছে বটফলের মতো।' বাংলা কবিতার এই অর্জন, এই সিদ্ধি প্রণবেন্দু ব্যতীত নিশ্চয়ই সম্ভব ছিল না। তাঁর উচ্চারণের বিষাদভূমিতে দাঁড়াতে আগ্রহী হলে এইসব পঙ্ক্তিমালার গভীরে প্রবেশ আবশ্যক:

১ অসুখী জীবন থেকে লাফ দিয়ে ধরে নিই চাঁদ
হাত পিছলিয়ে যায়, গুমরিয়ে ওঠে ডালপালা—
এ কোন জীবনে আছি এ কোন মৃত্যুর কাছাকাছি?
মানুষজনেরা শুধু মাঝে মাঝে উঁকি মেরে যায়।
আমি কি বুঝিয়ে বলতে পেরেছি, মানুষ কেন আছি? (চাঁদ ও বামন)

২ একটু একটু করে ধুলো ওড়ে,
আমরা মাইল মাইল শুধু হেঁটে যাচ্ছি
সমস্ত জীবন। (জীবন)

মানুষ ও জীবনের এহেন যূথবদ্ধতা থাকলেই জোড়া ময়ূর দেখা যায়। আর এই যূথবদ্ধ রূপের মৃত্যু ঘটে গেলে গোটা পৃথিবীই প্রেমহীন কর্কশ হয়ে যাবে। ক্যাম্বিসের খাটের ওপর পড়ে থাকবে দেশলাইবাক্স। যে কোনো মুহূর্তে তখন আগুন জ্বলে উঠবে। জীবন ছাড়া যে আগুন জ্বলে ওঠে, সে আগুন ধ্বংস করে, সৃষ্টি করে না—এই সত্যই প্রণবেন্দু-র কবিতাকে অন্য মাত্রা অন্য ব্যঞ্জনা দিয়েছে।

২

'বাধা পেরোনোর গান' কাব্যগ্রন্থে এসে আমরা দেখলাম দীপ্র এবং ক্ষিপ্র স্তবকে স্তবকে সাবলীল মেজাজের প্রকাশ। স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত মগ্নস্বভাবী—এই অভিধায় দীর্ঘদিন অভিষিক্ত হয়ে আসছেন প্রণবেন্দু। এই আবরণ তিনি সরিয়ে ফেললেন এই কাব্যগ্রন্থে এসে। ফুরফুরে, হালকা চালের ঘন আত্মকৌতুকে তিনি বলছেন সামান্য ঘটমানতার কথা। বলছেন প্রাত্যহিক ঘুম ও জাগরণের সঙ্গে জড়িত নানা ছায়া ও সন্ধির কথা। বলছেন বোলতা ও কামানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথা। বলছেন সাপ-সাপিনী ও বাঁয়া-তবলার কথা। মনে হবে, সবই গুরুত্বহীন। সবই সামান্য। কিন্তু একটু মনোযোগী হলেই টের পাওয়া সম্ভব গভীর সংবেদনী একটি প্রাত্যহিক ইতিহাসের পৃষ্ঠা যেন বা উন্মোচিত হয়ে যাচ্ছে। একটু স্পষ্টতায় কিন্তু ততোধিক নৈঃশব্দ্যে এই যে ক্রমিক ভাবনার উন্মোচন তা আমাদের অভিভূত করে দেয়। পঞ্চাশের অনেক কবির পুঁজি যখন ফুরিয়ে আসছে, প্রণবেন্দু তখন এক বিপন্ন বিমর্ষ নীড়কেন্দ্র থেকে উঠে এসে লিখে রাখছেন কম্পমান বিকীর্ণ জীবনেরই কথা। পঞ্চেন্দ্রিয় বাসনাকেন্দ্রে যে আলো ও ছায়ার বিচিত্র উদ্বেগ প্রতি মুহূর্তে জন্ম নিচ্ছে, তাকে গতিনির্ধারক ইতিহাসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন প্রণবেন্দু। প্রত্যেকদিন মানুষের মধ্যে যে নাড়ীকম্পন অনুভূত হয়, এও তো ইতিহাস। এই নাড়ীকম্পনের সঙ্গেই যুক্ত প্রবহমানের চাঞ্চল্য। নাড়ীকম্পনের সঙ্গে যুক্ত নেই কি? যুক্ত আছে প্রেম ও যৌনতা, যুক্ত আছে বিষাদ ও বিষ; যুক্ত আছে না ও হাঁ; যুক্ত আছে সময় ও ট্রাজিক বাস্তবতা। যুক্ত আছে অমিয় চক্রবর্তী কথিত *'Environmental details with the new courage of poetic faith'*; 'বাধা পেরোনোর গান' কাব্যগ্রন্থে এইসব 'দৃশ্যের প্রাত্যহিকতা' হয়ে উঠেছে ইতিহাস, ইহজীবনের স্পন্দিত ইতিহাস। কিভাবে 'দৃশ্যের প্রাত্যহিকতা'কে তিনি রূপান্তরিত করছেন সংশ্লেষী ইতিহাসে? উদাহরণ দেওয়া যাক :

১ পানের দোকানে গেলে আচমকা সাইকেল এসে ধাক্কা দেয়,
সাইকেল চালককে আমি চড় পর্যন্ত মারতে পারি না। (কাকে ফোঁস করব?)

২ গা ঘেঁসে দাঁড়াও কেন চপল বালিকা?
কেন গা ঘেঁসে দাঁড়াও? (আমাদের গল্প)

৩ কতোদিন পরে আজ তুমি ট্রেনে চড়ে
একটু বেড়াতে যাবে, ভেবে দ্যাখো। (অন্তর্ঘাত)

৪ একটা শাদা পুঁটলি ঐ পাশের পাড়ার ধোপারা ফেলে গেছে,
টিউবওয়েলের পাশে তবে কিসের ধুকধুকোনি? (শাদা পালক)

৫ সামনেই রয়েছে পথ, কখনোবা রথ, কখনোবা
শুধু ভুখা মানুষের অনন্ত মিছিল... (আজকে কবিতা)

৬ মানুষই গড়ে তার এই বাড়িঘর, পথঘাট, জমি,
তারপর হঠাৎ বিমূঢ় হয়ে নিশ্চল ঘড়ির মতো
শুধু জীবন ও আয়ুর দুটি কাঁটা নিয়ে স্তব্ধ বসে থাকে? (মানুষ ও রাস্তা)

এ রকম অজস্র উদাহরণ দেওয়া সম্ভব। এ-সবই দৃশ্যের প্রাত্যহিক। এ সবই *'Environmental details'*; এই সব দৃশ্যের প্রাত্যহিক স্পন্দনকে ইতিহাসের দিকে ঠেলে নিচ্ছেন প্রণবেন্দু কিভাবে? লক্ষ করা যাক উপরিউক্ত ৬টি উদ্ধৃতি। ১ নং উদ্ধৃতিতে স্পষ্ট কাপুরুষের ইতিহাস যার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট জীবনের অসহায় অপমানবোধ। ২ নং উদ্ধৃতিতে স্পষ্ট যৌন আকর্ষণের ইতিহাস, যার মধ্য দিয়ে ধরা পড়ছে দেহকামনার উদগ্র বিস্ফার। ৩ নং উদ্ধৃতিতে স্পষ্ট চার দেয়ালের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হবার ভ্রমণেচ্ছার ইতিহাস, যা আজকের অর্থমন্দা জীবনে স্বপ্নসমান। ৪ নং উদ্ধৃতিতে ধুঁকে মরা আবর্জনার ইতিহাস, যা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে আমরা কেমনভাবে বেঁচে আছি। ৫ নং উদ্ধৃতিতে সমবেত যন্ত্রণাপীড়িত মানব ইতিহাস, যা থেকে অনুমিত এই দেশজ কাঠামোর ক্ষুধার্ত অবস্থানভূমি। ৬ নং উদ্ধৃতিতে ধরা পড়েছে মৃত্যুভয়ের ইতিহাস, যা মানুষের গুছিয়ে তোলা জীবনকে থাবা দেবার জন্য চিরদিনই উন্মুখ। এইসব কিছুর মধ্যে প্রণবেন্দু শুনতে পান বেরালের ডাক। দ্রষ্টব্য 'বেরালের মতো' নামক কবিতাটি। দৈনন্দিন ইতিহাসের সময়বলয়ে প্রত্যেকটি মানুষই বেরালের 'ম্যাও ম্যাও' ডাক গলায় তুলে নিয়েছে। প্রণবেন্দু দেখতে পান জনবসতির মধ্যে একলা ঘুরে বেড়াচ্ছে শেয়ালী। ট্যারাচোখ। এক অর্থগৃধ্নু অভীপ্সায় পার্থিবতার তামাসায় যুক্ত হয়ে আছে। দ্রষ্টব্য 'কে কাকে হরণ করবে' কবিতাটি। এভাবেই বেরাল ও শেয়ালীদের সঙ্গে তৈরি হয়ে উঠছে এক পিচ্ছিল সমাজ। আমরা ক্রমশ সেঁদিয়ে যাচ্ছি কিলবিল ধোঁয়ায় জঞ্জালের গহ্বরে। এই শহর এবং শহরতলির

গা থেকে বেরোচ্ছে আঁশটে গন্ধ। আর সবকিছুর কেন্দ্রে জীবনসত্যে খাবি খাচ্ছে আমাদের চর্বিতচর্বন গল্প। 'এখনও সময় আছে' কবিতায় তাই বোধবুদ্ধিহীন মানুষজনকে প্রণবেন্দু 'হে গাড়োল, পরম গাড়োল' বলে বিদ্রূপ করেও নিজের চাপা কণ্ঠটাকে কিন্তু লুকিয়ে রাখেননি। এই কবিতায় তিনি এমন এক চাবির কথা বলেছেন, যে চাবি উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম সবদিকেরই বন্ধ তালাগুলো খুলে দিতে পারে। পড়তে পড়তে মনে পড়ে যায় জীবনানন্দের একটি মূল্যবান উক্তি ঃ

> কবিতা ও জীবন একই জিনিষের দুরকম উৎসারণ, জীবন বলতে গেলে আমরা সচরাচর যা বুঝি তার ভিতর বাস্তব নামে আমরা সাধারণত যা জানি তা রয়েছে, কিন্তু অসংলগ্ন অব্যবস্থিত জীবনের দিকে তাকিয়ে কবির কল্পনা-প্রতিভা কিংবা মানুষের ইমাজিনেশন সম্পূর্ণভাবে তৃপ্ত হয় না; কিন্তু কবিতা সৃষ্টি করে কবির বিবেক সান্ত্বনা পায়, তার কল্পনামনীষা শান্তিবোধ করে।
> (কবিতার কথা ঃ নামপ্রবন্ধ ঃ পৃ—১৩, সিগনেট ১৩৯২ পঞ্চম সংস্করণ)

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত'র কবিতায় খুব চমৎকার চেতনাকারুকর্মে এই চারপাশের 'অসংলগ্ন অব্যবস্থিত জীবন' ধরা পড়েছে। এক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কথা অনিবার্য উল্লেখযোগ্য। তিনি 'যাদবপুর' অঞ্চলের সীমাছায়ায় গোটা পৃথিবীর অব্যবস্থিত জীবনকে প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর কবিতায় যাদবপুর-এর বিন্যাস এইরকম ঃ

যাদবপুর = মাস্তুল = সামিয়ানা =
রিকশা = কাক =
গুঞ্জন = প্রতিবাদ =
সন্তপ্ত হৃদয় = অবক্ষয়....

যাদবপুর = চলন্ত আঁধার = হ্যাজাক লণ্ঠন =
ফুরফুরে হাওয়া = হরিধ্বনি =
অবক্ষয় = ভ্যাগ = ঘুম.....

'এখন গুজব নেই' এবং 'বাধা পেরোনোর গান' গ্রন্থদ্বয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে পারলে উপরিউক্ত বিন্যাসটি কারো নজর এড়িয়ে যাবে না। দুটি গ্রন্থ থেকে দুটি কবিতার নামোল্লেখই যথেষ্ট। 'এখন গুজব নেই' কাব্যগ্রন্থের 'পাগল পৃথিবী' লক্ষ করা দরকার। কিংবা 'বাধা পেরোনোর গান' গ্রন্থের 'কাক' কবিতাটিও। যাদবপুর অঞ্চলকে তিনি যেভাবে 'অসংলগ্ন অব্যবস্থিত জীবন'-এর প্রতিনিধি-

স্বরূপ ক'রে তুলেছেন, তাতে এটাই স্বাভাবিক যে একটুকরো মাংস মুখে নিয়ে ঘোর কাক বসে আছে ; যে মাংস ও কাকের গড়ে সহাবস্থান আসলে তৈরি করছে এক লোলুপ *atmosphere*, তৈরি করছে আমাদেরই প্রাত্যহিক নগ্ন অবস্থান-ভূমির কাতরতা। সামিয়ানাটাঙানো এই পৃথিবী যে শূন্যগর্ভ সময়বহনকারী, তার প্রমাণ এই জীবনের গ্যাস-ওভেনের চেঁচামেচি। একদা বুদ্ধদেব বসু আক্ষেপ করে বলেছিলেন—'আমাদের রান্নাঘর, চায়ের দোকান, ট্রাম-বাসসংকুল রাস্তা, মোটর, রেলগাড়ি—কেন আমাদের কবিতায় স্থান পাবে না? আমাদের ছোটো-খাটো সুখদুঃখ, ঝগড়াঝাঁটি, স্নেহ বিদ্বেষ কবে আমাদের কবিতাকে রূপ দেবে?' বুদ্ধদেব যে ঘরোয়া জীবনকে কবিতায় পেতে চেয়েছিলেন, প্রণবেন্দু সেই ঘরোয়া জীবনকে, সেই আঁচড়কামড়কে, সেই অন্তর্ঘাতময় বিমূঢ় আর্তনাদকে প্রাত্যহিকের ইতিহাসে এনেছেন। দ্রষ্টব্য 'মানুষের সঙ্গে মানুষ' কবিতাটি ঃ

....ভেবে দ্যাখে কেউ না কেউ কোনোখানে
মানুষের ইতিহাস লিখে ফেলছে একা।
সবারই তো নাম থাকবার কথা, তোমার, আমার, তাহাদের।
কিংবা আলাদা আলাদাভাবে নাম হয়তো নেই
তাতেই বা কতটুকু ক্ষতি? কার ক্ষতি?

এই ইতিহাসচেতনা অতীতমুখীন কিংবা ব্যক্তিসর্বস্ব অহংসুলভ নয়। 'তাহাদের' শব্দের সচেতন প্রয়োগে যে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়েছে, সে ব্যঞ্জনা একালেরই সম্পদ। এই কবিতারই একটি সবিশেষ পঙ্‌ক্তি—'আমার মুখোস আমি পুড়িয়ে ফেলেছি।' 'মুখোস' পোড়াতে না পারলে এই গভীর অর্থবাহী জীবননির্ভর ইতিহাসবলয়ে আদৌ পৌঁছোনো সম্ভব ছিল না। মুখোসহীন মানুষ বলেই 'তিন আমেরিকান' কবিতায় তিনি শুদ্ধ ও শিকড়সন্ধানীন হয়ে বলতে পারেন—'আমি আরো যোগাযোগ চাই, সাঁকো চাই, চলাচল চাই,।' প্রণবেন্দু নিজ কবিস্বর সম্বন্ধে স্থির। জানেন, জনহিতকারণে কিংবা দাবিদাওয়া জানাতে তাঁর কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে কখনোই পৌঁছোনো সম্ভব নয়। কিন্তু চারপাশের বিপর্যস্ত সময়কালে তাঁর শংকিত পাঁজর ঠেলে গলগল করে উঠছে অজস্র কথা, অজস্র 'প্রতিবাদ'। ফলত তাঁকে লিখতে হয় ঃ

....এখনও তো গলার স্বর চড়াতে পারি না
আমারই গলার স্বর
আমি চড়াবো কিভাবে?
তবে যদি চিৎকার করে উঠি অন্ধকারে!

কিছুই না, হৃৎপিণ্ড মাইক্রোফোনের মতো ক'রে
সে-ই একই ফিশফিশ করে উঠি !
হয়তো দু-এক ফোটা রক্ত পড়বে, প্রতিবাদ শুধু এই,
আর কিছু নয় ।

সমাজ, বাস্তব, চারপাশ ছিঁড়ে খুঁড়ে তন্ময় পোস্টমর্টেমের পরও এই যে মনোদীর্ণ বেদনাবোধ—যা রয়েছে 'প্রতিবাদ' এবং 'প্রতিবাদ করো' নামের দুটি কবিতায়—তা থেকেই প্রমাণিত হয়ে যায় একজন জাত কবির চেতনাপ্রান্তর। অজস্র অসাধারণ কবিতার ধারক বাহক এই মধ্য পর্যায়ের কাব্যগ্রন্থদুটি। প্রণবেন্দুর দূরবীন (দ্রষ্টব্য 'বাধা পেরোনোর গান' গ্রন্থের 'কুম্ভীরাশ্রু') যে কতোখানি সূর্য-প্রকাশের মাধ্যম, গরিব দেশের শ্বাসে ভরা, তা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন ব'লে নয়, প্রণবেন্দু ফোঁস করছেন চেতনাধর্ম এবং চলনধর্মের আভ্যন্তরীন ক্রিয়াতাড়নায়। 'এখন গুজব নেই' গ্রন্থের 'জীবন' কবিতা থেকেই তিনি লাফ দিয়েছেন 'বাধা পেরোনোর গান' গ্রন্থের 'প্রতিবাদ' কবিতায়। 'এখন গুজব নেই' গ্রন্থের 'প্রেম' কবিতা থেকেই তিনি এসে পৌঁছেছেন 'বাধা পেরোনোর গান' গ্রন্থের 'জৈব'★ কবিতায়। এই লাফানো কিংবা এই পৌঁছানো যে দুটি কাব্যগ্রন্থকে কার্যকারণসূত্রে অন্বিত করেছে, তা পাঠককে উপলব্ধি করতেই হবে। মাত্র ৮ লাইনের 'জৈব' কবিতাটি সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা, অনুমিত হয়। কারণ, এই কবিতাতেই তো তিনি লিখেছেন সেই চিরকালীন জননীজঠরের কথা, যেখানে জিওল গাছ থেকে শুরু করে আমরা সবাই একই মেলবন্ধনে বপন ক'রে চলেছি নিজস্ব বীজ এবং নিজস্ব আগুন। বপন ক'রে চলেছি ঝিম-ধরা পৃথিবীতে একটু ভালোভাবে বেঁচে থাকবার নকশা, শব্দ এবং নীরবতা।

★ (প্রথম প্রকাশিত : একান্তর, শারদীয়া ১৩৯৮)

প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের একটি কবিতা

সুজিত সরকার

এখন দুঃখের ডানা

এখন দুঃখের ডানা ভারি হ'য়ে আসে—
পাখি হয়তো আরো একটু পরে
নিচে নেমে আসবে কখনো,
ছাদের কার্নিসে ব'সে, নির্নিমেষে তাকিয়ে তাকিয়ে
বুঝে উঠতে চাইবে
তার কতোটুকু যাওয়া বাকি, কতোখানি কাজ সারা হ'লো।
তখন তোমরা তাকে বিরক্ত ক'রো না।
হাততালি দিয়ে আরো দিয়ো না উড়িয়ে,
তাকে ব'সতে দিয়ো।

এখন দুঃখের ডানা ভারি হ'য়ে আসে।
এখন দুঃখের ডানা ক্রমশই ভারি হ'য়ে আসে ।।

সে অনেকদিন আগের কথা। আমি তখন বাইশ বছরের যুবা। ইউনিভার্সিটির ছাত্র। আমার সম্পাদিত শীর্ণ কবিতাপত্রিকা 'শোণপাংশু'র প্রথম সংখ্যায় প্রণবেন্দু দাশগুপ্তর কবিতার ওপরে খুবই ছোট একটি গদ্য লিখেছিলুম। পত্রিকাটি ডাকযোগে তাঁকে পাঠানোর পর পোস্টকার্ডে তিনি জানালেন, আমার ছোট আলোচনাটি তাঁকে মুগ্ধ ও খুশি করেছে। তিনি আমাকে দেখা করতে বললেন, পাঠাতে বললেন 'অলিন্দে'র জন্য কবিতা। সেই শুরু। তারপর 'অলিন্দে'র এমন কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি, যাতে আমি লিখিনি। শুধু কবিতা নয়, একাধিক প্রবন্ধ লিখেছি, একাধিক গ্রন্থ সমালোচনাও প্রকাশিত হয়েছে। 'অলিন্দে'র এমন সংখ্যাও প্রকাশিত হয়েছে যাতে আমি শুধু কবি হিসেবে নয়, প্রাবন্ধিক হিসেবেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছি। এইভাবে যত দিন গেছে, ততই ক্রমশ কাছে চ'লে এসেছি তাঁর। তারপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন এম. ফিল. করতে গেছি, তখন তাঁকে পেয়েছি শিক্ষক হিসেবে। হয়তো সতীর্থদের সঙ্গে ক্যান্টিনে আড্ডা দিচ্ছি, হঠাৎ সেখানে প্রবেশ ক'রে তিনি আমাকে ডেকে নিলেন, বললেন : 'চলো আমার বাড়ি, নতুন অনেকগুলি কবিতা লিখেছি, তোমাকে শোনাবো।' কতো দিন কতো বিভিন্নভাবে যে তাঁকে কাছ থেকে দেখেছি, আর দেখতে দেখতে আবিষ্কার করেছি, রিলাকে মতো তিনিও আপাদমস্তক কবি, প্রতি মুহূর্তে কবি, আত্মমগ্ন

নিঃসঙ্গ এক মানুষ। তাই হয়তো তিনি বলতে পারেন : 'একজন কবি যখন নিচু হয়ে জুতোর ফিতে বাঁধেন, তখনও তিনি কবি।' সত্যি বলতে কি, আর কোনো অগ্রজ কবির কাছে এতখানি স্নেহ ও প্রশ্রয় আমার জীবনে আমি কখনও পাইনি। কোথায় যাদবপুর, কোথায় হাওড়া। তবু কতোবার যে ট্যাক্সি ক'রে তিনি চ'লে এসেছেন আমার বাড়ি! নিঃসন্তান তিনি আমাকে পুত্রের মতো স্নেহ করেছেন, আমিও কখন যেন অজান্তে তাঁকে আমার দ্বিতীয় পিতা হিসেবে ভাবতে শুরু করেছি।

কথায় কথায় অনেক দূরে চ'লে এলাম। যে কথাটা বলার জন্যে এত কথা বলা, সেটা এই যে, প্রথম যেদিন তাঁর বাড়ি গিয়েছিলুম, সেদিন দেখেছিলুম তাঁর ঘরের কার্পেটে তুলোর বলের মতো কয়েকটি খরগোশ খেলা করছে, আর তাঁর বিদেশিনী স্ত্রী মাঝে মাঝে তাদের কোলে নিয়ে আদর করছেন। এই খরগোশের কথা তাঁর একাধিক কবিতায় তিনি বলেছেন, পাখিদের কথাও বলেছেন অনেক কবিতায়। 'পশু, পাখি এবং মানুষ' কবিতাটির প্রথম দুটি স্তবক এখানে উদ্ধৃত করছি :

"কী যে হয়!" —ব'লে, চ'মকে উড়ে যায় পাখি,
আরো কিছুক্ষণ পরে প্রতিধ্বনি "কী যে হয়, কী যে হয়, কী যে····"
পোষা খরগোশ ছিলো—সেও ছুটে গিয়েছে বাগানে,
ঘাসের পৃথিবী কিছু ভিজে।

পশুপাখি নিয়ে খুব ভালো থাকি—অথচ বিকেলে
বিশুদ্ধ প্রতীক হ'য়ে ওরা আসে কবিতার দিকে।
আমি বাধা দিই, বলি : "সরাসরি এসো,
সবাই নিজস্ব হও নিজের নিরিখে।"

পাখি তাঁর অনেক কবিতায় 'বিশুদ্ধ প্রতীক' হয়েই এসেছে, আবার 'সরাসরি'ও এসেছে বেশ কিছু কবিতায়। আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট কবিতাটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা যায়, পাখি এখানে 'বিশুদ্ধ প্রতীক' রূপেই উপস্থিত হয়েছে। কীসের প্রতীক এই পাখি? —এই প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে, পাখি যে কতোবার কতো বিভিন্নভাবে তাঁর কবিতায় ফিরে ফিরে এসেছে—তার কিছু দৃষ্টান্ত এখানে দেবার চেষ্টা করছি।

(ক) মুখে খড়কুটো নিয়ে যে পাখি এসেছে, তার কাছে,
সাইকেল নামিয়ে রেখে যে ছেলে আসছে, তার কাছে,
যে ভাঙা-বিনুনি নিয়ে দৌড়ে গেলো, আজ তারো কাছে
আমি করজোড়ে বলি : এসো, কাছে এসো,
অন্ধকারে আমরা কেন এখনো একাকী? (অন্ধকারে আরো কাছে এসো)

(খ) দুপো কাক, আরো দুটো কাক, আরো কাক
কুয়াশার মধ্য দিয়ে সাঁতরিয়ে গেলো ঐ দূরের ভেতরে। (দুঃখ)

(গ) অন্ধকারে, বিপুল মেঘের সঙ্গে দেখাশুনো ক'রে
ব'সে থাকি।
পুরো পৃথিবীকে একবারে দেখা গেলে, খুব ভালো হ'তো।
এক ঝাঁক পাখি শুধু আকাশ ধবল ক'রে উড়ে যায়। (পুরো পৃথিবীর জন্য)

উপরোদ্ধৃত পংক্তিগুলি থেকে মনে হ'তেই পারে যে প্রতীকরূপে নয়, এসব কবিতায় পাখি এসেছে 'সরাসরি'। কিন্তু সত্যি কি তাই? একটি কবিতায় প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত বলেছিলেন : 'শুধুই সংকেত আছে'। এরই পাশাপাশি উল্লেখ করা যাক, অন্য একটি কবিতার কয়েকটি লাইন :

আমি সব টের পাই!
আলিসায় একা কাক মুখে ভাঙা-অন্ধকার নিয়ে
ব'সে আছে, তার ডানার ঝাপ্টে
সোজা বুকে এসে লাগে।

এখন, দুটি কবিতার উদ্ধৃত অংশ যুক্ত ক'রে আমরা এরকম এক ধারণায় পৌঁছতে পারি, পাখির উড়ে যাওয়া অথবা ব'সে থাকা কোনো একটি বিশেষ ঘটনা বা মুহূর্তকে অর্থময় ক'রে তুলতে চায়। একবার এই ধারণায় উপনীত হ'লে আর বুঝতে অসুবিধে হয় না যে ঘাটশিলায় রাত্রিবেলা একটা পাখির 'গুব্ গুব্' ডাক কিংবা 'শূন্যে ছোরা মেরে' দুটো পাখির উড়ে যাওয়া অথবা 'নারকোলের ডাল থেকে' দুটো চিলের হঠাৎ শূন্যে লাফ দেওয়া শুধুমাত্র আবহসৃষ্টির জন্য কবিতায় বর্ণিত হয়নি—তাদের উপস্থিতি ইঙ্গিতপূর্ণ, যেন তাদের এই ওড়াওড়ির মধ্যে দিয়ে কোনো এক গভীর সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে চায়। 'পারো না কি সমস্ত সংকেত থেকে / বুঝে নিতে অর্থের আভাস?' —প্রশ্ন রেখেছিলেন প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত একটি কবিতায়। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নিতে পারি তাঁরই একটি অন্য কবিতা থেকে :

এভাবে সংকেত করে সব কিছু—আমি লুফে নিই
যা কিছু খবর, বার্তা, প্রতিটি মুহূর্ত জুড়ে
যা আমাকে রশদ পাঠিয়ে চলে আজীবন।

আর তাই, কাক উড়ে গেলে, তিনিও কলম নিয়ে 'স্তব্ধ পাতার দিকে' ঝুঁকে পড়েন একা। বোঝা যায়, অন্ধকারে প'ড়ে যেতে যেতে যখন আবার দেয়াল ধ'রে নিঃসঙ্গ মানুষ উঠে পড়ে, তখন কেন গাছের আড়াল থেকে দুটো হরিয়াল শব্দ ক'রে ওঠে কিংবা কবির ভিতরে যখন এই প্রশ্ন জেগে ওঠে : 'সামনে কি কিছু আছে ?' তখন কেন বাইরের পৃথিবীতে একটি পাখি ক্রমাগত শব্দ ক'রে ওঠে।

'শ্বেত পারাবত' কবিতায় পারাবত স্পষ্টতই প্রতীক, যেমন আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট এই কবিতায় 'পাখি'ও প্রতীক। এখানে অবশ্যই জানানো দরকার যে 'এখন দুঃখের ডানা' কবিতাটি 'মানুষের দিকে' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। আরো জানানো দরকার, এই কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গপত্রে তিনি উদ্ধৃত করেছেন মার্ক শ্যাগালের একটি উক্তি : 'If you want to touch people's hearts, you must weep softly.' পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থ 'হাওয়া স্পর্শ করো' তে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন 'মানুষ কি মানুষের জন্য আজ সমব্যথাতুর ?' একলা মানুষ, বিষণ্ণ মানুষ, দুঃখ পেয়ে পেয়ে বেঁকে যাওয়া মানুষের জন্য সমব্যথাতুর হয়ে উঠুক অন্য মানুষ—এই আশা থেকে রচিত হয়েছে 'মানুষের দিকে' কাব্যগ্রন্থটি। এই কাব্য-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কবিতা প'ড়ে আমি নতুনভাবে বাঁচতে শিখেছি, নতুনভাবে জীবনের দিকে তাকাতে শিখেছি। বাসে কিংবা রাস্তায় মানুষের ভীড়ে পাশের যে লোকটির দিকে আমি কখনও তেমনভাবে তাকাইনি, তার দিকে স্পষ্টভাবে তাকাতে শিখেছি, কারণ

আমাদের প্রত্যেকের স্নায়ু ছুঁয়ে ছুঁয়ে
টেলিগ্রাফের তার অনন্ত আকাশে মিশে গেছে—

একটি মানুষও যদি দুঃখে কেঁপে ওঠে
তার ঝংকার আজ
সমস্ত জীবন ধ'রে আলোড়িত হবে।

এই কাব্যগ্রন্থ প'ড়ে আমি আরো বুঝতে শিখেছি, যে লোকটি আত্মহত্যা করে, তার মৃত্যুর জন্য আমরাও দায়ী, কারণ সে তো সত্যিই মরতে চায়নি, 'আর পাঁচজন তাকে প্রতিদিন একটু একটু ক'রে / নিহত করেছে—সে তখন ভদ্রতাবশত / কোনো বাধা দিতে চায়নি'। 'এখন দুঃখের ডানা' যেহেতু এই কাব্যগ্রন্থেরই অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু পাখি যে দুঃখী মানুষের প্রতীক, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহই থাকে না। তাছাড়া, পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'অন্ধ প্রাণ, জাগো'র অন্তর্ভুক্ত একটি কবিতায় প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত পাখিকে মানুষের সঙ্গে তুলনা করেছেন : 'অন্ধকারে ভুতুড়ে পাখির মতো ব'সে ব'সে / আমরা সব টের পেয়ে যাই'। 'দুঃখের ডানা'

ভারি হয়ে এসেছে যে পাখির, কবি জানেন, সে একটু পরে নিচে নেমে আসবে, কারণ এই কাব্যগ্রন্থের অন্য একটি কবিতায় কবি বলেছেন : 'একা একা কিছুদূর যাওয়া যায়। / তারপর খুব ক্লান্ত লাগে। / মনে হয়, পাশে কেউ থাকলে ভালো হ'তো' কিংবা আরেকটি কবিতায় তাঁকে বলতে শুনি : 'প্রেমের কাঙাল এই মানুষেরা / দীর্ঘদিন একা একা থাকতে পারে না'। পাখি যখন নেমে এসে ছাদের কার্নিসে বসবে, তখন তাকে যেন হাততালি দিয়ে আমরা উড়িয়ে না দিই অর্থাৎ বিষণ্ণ মানুষ যখন দুঃখ ভুলতে আর এক মানুষের কাছে এসে বসতে চায়, তখন সে যেন তাকে বসতে দেয়, তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়, কারণ

মানুষ পারে না।
এক জায়গায় এসে স্পষ্ট ভেঙে পড়ে।

তাকে যদি আরো কিছু ভালোবাসা দিতো পাঁচজন
তবে হয়তো স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতো কিছুদিন,

কিন্তু কবি যখন বলেন : 'ছাদের কার্নিসে ব'সে নির্নিমেষে তাকিয়ে তাকিয়ে / বুঝে উঠতে চাইবে / তার কতোটুকু যাওয়া বাকি, কতোখানি কাজ সারা হ'লো', তখন মনে হয়, পাখি শুধু মানুষের প্রতীক নয়, কবিরও প্রতীক। মনে পড়ে, ওয়র্ডস্‌ওয়র্থের স্কাইলার্কের কথা, যে আকাশে ওড়ে, অথচ যার বাসা মাটির পৃথিবীতে। কবিও তো মানুষের মধ্যেই থাকেন, কিন্তু তাঁর মন সর্বদাই ভেসে বেড়ায় ঊর্দ্ধলোকে। মনে পড়ে, বোদলেয়ারের আলবাট্রসের কথা, যে 'আকাশযাত্রী', অথচ নাবিকেরা যখন তাকে ধ'রে ফেলে, তখন ওই 'নীলিমার সম্রাট' কেমন 'অসহায়'! কবিতাটির শেষে বোদলেয়ার নিজেই বলেন, কবি ওই আলবা-ট্রসের মতোই, কারণ তাঁর মন ঊর্দ্ধগামী হ'লেও তাঁকে থাকতে হয় 'মৃত্তিকার নির্বাসনে'। আরো মনে পড়ে, মালার্মের রাজহংসের কথা, বরফের নিচে যে ধীরে ধীরে চাপা প'ড়ে যায়।

সবশেষে বলি, এই কবিতায় কবি সচেতনভাবে ***refrain***-এর ব্যবহার করেছেন। 'এখন দুঃখের ডানা ভারি হয়ে আসে'—এই লাইনটি কবিতাটিতে ফিরে ফিরে এসেছে। অমিয় চক্রবর্তীর 'ওক্লাহোমা' কবিতায় ***refrain***-এর ব্যবহার হয়তো অনেকেরই মনে আছে :

মার্কিন ডাঙার বুকে ঝোড়ো অবসান গেল মিশে।
অবসান গেল মিশে ॥

এই ***refrain***-এর সাহায্যে অমিয় চক্রবর্তী প্রেমিকার বুকভরা হাহাকারকেই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। অমিয় চক্রবর্তী প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের অন্যতম প্রিয় কবি।

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার সঙ্গে প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের কবিতার সাদৃশ্য এইখানেই যে দুজনেই অস্তিবাদী কবি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, এম. ফিল.-এ আমার গবেষণার বিষয় ছিল : 'অমিয় চক্রবর্তী ও হপকিন্‌সের কবিতার তুলনামূলক আলোচনা' এবং আমার 'গাইড' ছিলেন প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত। পাখিটির চক্রাকারে ওড়া, একাকিত্ব, ক্লান্তি, বিষণ্ণতা ও ক্রমশ নিচে নেমে আসা—সবকিছুই *refrain*-এর মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে :

এখন দুঃখের ডানা ভারি হয়ে আসে।
এখন দুঃখের ডানা ক্রমশই ভারি হ'য়ে আসে ॥

কয়েকজন কুমোরের কাহিনী / প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত
নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

শূন্য থেকে পরিত্রাণ খুঁজি ব'লে
মাটি ও কাদায় আমরা একটা কিছু গ'ড়ে নিতে চাই।

পুতুল, পুতুল, তুমি ঠিক মতো তৈরী হয়েছো তো!
তোমার ওপরে কিন্তু আমাদের সব কিছু নির্ভর করে।
আমাদের আঙুলের টান্‌টোনে সমস্ত হৃদয় ঝ'রে যায়,
হৃদয়ের সঙ্গে, দ্যাখো, গ্রহ-তারা-অনন্ত আকাশ বাঁধা থাকে,
দুই চোখে যতদূর দেখা যায়, তারো পরে আরো কিছু
ঝল্‌সে ওঠে যেন—

সেই দৃষ্টি মৃত্যু কিংবা পরাজয় কিছুই মানে না,
শুধু দেখে নিতে চায়, দেখে নিয়ে বুঝে উঠতে চায়
কিভাবে একটা ফল পেকে ওঠে, কমলা-গোলাপী
কোন্ রং ফুটে ওঠে আমের বোঁটায়—

শূন্য থেকে মুক্তি চাই।
শূন্য থেকে আমাদের পরিত্রাণ চাই।
আমাদের একটা কিছু গ'ড়ে যেতে হবে ॥

প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের প্রায় সমস্ত কবিতার মতোই উদ্ধৃত কবিতাটিও আপাত-দৃষ্টিতে সরল। প্রথম পাঠে যে কোনো পাঠকেরই এরকম মনে হ'তে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় বা তৃতীয় পাঠে সেই ভুল ভাঙবেই। আমার ধারণা কবিতাটি অর্থ-ব্যঞ্জনায় বেশ জটিল ; এবং শুধু তাই নয়, পরিণত প্রণবেন্দুর 'দর্শন'-কে বা 'জীবনবোধ'-কে বুঝতে এই কবিতাটি, চাবির ভূমিকা পালন করে। 'জীবনবোধ' শব্দটি ওজস্বী, প্রাচীন, অনাধুনিক এবং রবীন্দ্র-অনুষঙ্গ বাহক ; —এ ব্যাপারে আমি পূর্ণমাত্রায় সচেতন। তথাপি এই শব্দটি ব্যবহার করলাম। কেননা প্রণবেন্দু নিজেও 'জীবনবোধ' শব্দটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকায় তিনি আমাদের জানিয়েছেন—'.....সমস্ত পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্যেও একটা অচ্ছিন্ন সত্তা হয়তো কোথাও থেকে যায়। যাকে আমি নাম দিয়েছি জীবনবোধ.....' [শ্রেষ্ঠ কবিতা / নাভানা থেকে প্রকাশিত] এবং অন্যত্র একটি সাক্ষাৎকারে প্রণবেন্দু সরাসরি বলেন—'কিন্তু মূল সূত্র হচ্ছে জীবনবোধ, এবং তাকে আভাসিত করা।' [আলো অন্ধকার / সংখ্যা জানুয়ারি, '৯০]

এবার কবিতাটি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করা যাক। কবিতাটির নাম—'কয়েকজন কুমোরের কাহিনী'—। প্রশ্ন আসে মনে—'কয়েকজন' কেন? একজনও তো হ'তে পারত। ····একজন কুমোরের কাহিনী? —কুমোর? অর্থাৎ মৃৎশিল্পী। কবিতাটিতে কী শুধু মৃৎশিল্পীদের কথাই বলতে চাওয়া হয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তর সরাসরি দেওয়া যায়। ····না, শুধুই মৃৎশিল্পীদের কাহিনী বলতে চাননি কবি। প্রকৃত প্রস্তাবে, মৃৎশিল্পীদের আবহে তিনি সব ধরনের শিল্পী বা যে কোনো শিল্পীর কথাই বলতে চেয়েছেন। তিনি কবি হ'তে পারেন, কথাসাহিত্যিক হ'তে পারেন, চিত্রকর, বা ভাস্করও হ'তে পারেন। কিন্তু 'কাহিনী'? —এই প্রাচীন এবং আখ্যানগন্ধী শব্দটি কী একটু ভারসাম্যহীন, আরোপিত এবং লক্ষ্যহীন মনে হয় না আমাদের? কবিতাটি সম্পূর্ণ পড়ার পর আমরা বুঝি এখানে কোনো কাহিনী বা গল্পসূত্র বিবৃত হয়নি; শিল্প এবং জীবন বিষয়ে এক মহাবোধ,—যা জীবনানন্দের ভাষায়—'ভাবনাপ্রতিভা'ও বলা যায়, কিংবা এক উপলব্ধি, কবিতার আঙ্গিকে উদ্ভাসিত হয়েছে যেন; অথবা 'আভাসিত' হয়েছে; —মহাকবি শেলীর ব্যাখ্যায় যাকে বলা যায়—*'image of life expressed in its eternal truth' (A Defence of Poetry | P. B. Shelley)*। তবুও মনে হয়, 'কাহিনী' শব্দটি কবির ইচ্ছাপ্রসূত। প্রথমত, তাঁর লক্ষ্য এক সংবদ্ধ ধ্বনিতরঙ্গ বা অনুপ্রাসের ঝংকার সৃষ্টি করা। দ্বিতীয়ত, 'কুমোরের' মতো 'কাহিনী'ও এখানে শুধুই আক্ষরিক প্রচ্ছদ; প্রচ্ছদের অন্তরালে আছে গূঢ় ইঙ্গিত ও গভীর ব্যঞ্জনা।

প্রথম দুটি পঙ্‌ক্তি ভারী ও বিবৃতিধর্মী। 'শূন্য থেকে পরিত্রাণ খুঁজি ব'লে / মাটি ও কাদায় আমরা একটা কিছু গ'ড়ে নিতে চাই।' প্রথমে ২ মাত্রা—[শূন্য থেকে / পরিত্রাণ খুঁজি ব'লে] এবং পরে ৩ মাত্রা—[মাটি ও কাদায় / আমরা একটা কিছু / গ'ড়ে নিতে চাই] ফলে এই দুটি পঙ্‌ক্তি স্বয়ংসম্পূর্ণ। সে কারণেই একটি পূর্ণচ্ছেদ। এবং পরবর্তী স্তবকগুলি যেন এই দৃঢ়, আত্মবিশ্বাসী, নিশ্চিত, নিঃসংশয় ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ বিবৃতির বিস্তার, কাব্যরূপময় বিস্তার। 'পরিত্রাণ' শব্দটিতেও বেশ ঝাঁকুনি এবং টান আছে। শেষ স্তবকের প্রথম পঙ্‌ক্তিতে 'মুক্তি' শব্দটি একবার ব্যবহৃত হয়েছে। 'মুক্তি' শব্দটি কী প্রথমেও ব্যবহার করা চলত না? শূন্য থেকে 'মুক্তি' খুঁজি বলে—? কিন্তু 'মুক্তি'-র থেকে 'পরিত্রাণ' যেন অনেক বেশি অর্থবহ এবং ওজস্বী। 'পরিত্রাণ' শব্দটিতে যেন মেশানো আছে আর্তি,—আকুল এক আর্তি। 'শূন্য'—অর্থাৎ একাকীত্ব; অস্তিত্বের অর্থহীনতা কিংবা হাল-ভাঙা জাহাজের মতো জীবনের উদ্দেশ্যহীনতা। 'বাঁজ' কাব্যনাটকে

প্রণবেন্দু 'শূন্য' শব্দটি একাকীত্বের অসহায়তা বোঝাতে দু-বার ব্যবহার করেছেন—

(ক) 'শূন্য শুধু শূন্য, শুধু শূন্য, শুধু শিস-দেওয়া
হাওয়া / বাইরের উঠোন থেকে ঘরের ভেতরে,
আর ঘরের ভেতর থেকে / বাইরের বাগানে'

(খ) 'সব কিছু একদিন শূন্য ব'লে মনে হবে। / তবু
আমরা বেঁচে থাকবো, ভব····'

তাহলে একাকিত্বের নাগপাশ থেকে বাঁচবার জন্য, অস্তিত্বকে যুক্তিগ্রাহ্য, যন্ত্রণা-হীন এবং অর্থময় ক'রে তোলার জন্যই কিছু কর্মের প্রয়োজন; 'মাটি ও কাদায়' কিছু একটা গ'ড়ে তোলার প্রস্তাব। যেন অস্তিত্ববাদী দর্শনের (*Existentialism)* একটা আভাস পাওয়া যায়। কির্য়েকাগার্দ বা সার্ত্র—যা ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন তাঁদের রচনায়। এই দর্শনের মূল কথাই হ'ল—জীবনকে সার্থক বা অর্থবহ (*meaningful*) ক'রে তুলতে হলে চাই স্থির লক্ষ্য, প্রতিশ্রুতি এবং বিপুল কর্মোদ্যোগ (*Commitment*)। মানবজীবন অদৃষ্ট-নির্ধারিত নয়। পুনর্জন্মেও বিশ্বাসী নয় অস্তিত্ববাদীরা। একটাই জীবন দেওয়া হয়েছে আমাদের। এবং তা নশ্বর, ক্ষণস্থায়ী, অনিশ্চিতও বটে। এই জীবনকে ভরিয়ে তুলতে হবে কর্মে, গানে, শিল্পে, সম্ভাবনায়। এবং সেটাই হবে আদর্শ জীবনযাপন। প্রসঙ্গ-ক্রমে আমাদের মনে পড়ে যেতে পারে—রিলকের ডুইনো এলিজি—কবিতাবলীর, নবম এলিজি-র সেই গভীর এবং দর্শনঋদ্ধ পর্যবেক্ষণ—

.....Us the most fleeting of all. Just once,
everything, only for once. Once and no more. And we, too,
Once. And neven again. But this
having been once, though only once,
having been once on earth—Can it ever be cancelled?

And so we keep pressing on and trying to perform it,
trying to contain in within our simple hands,
In the more and more crowded gaze, in the speechless heart.

দ্বিতীয় স্তবকে বলবার ভঙ্গি সম্পূর্ণ পালটে গেল। 'পুতুল, পুতুল তুমি ঠিকমতো তৈরী হয়েছো তো?'—আবেগঘন এক জিজ্ঞাসার আদলে ভাবনাকে তছ্‌নছ্‌ ক'রে এক স্বগতোক্তি!.... শিল্পীর নির্জন জিজ্ঞাসা নিজেকে। কেননা, কাদা ও মাটি দিয়ে, কিংবা শব্দ দিয়ে, অথবা পাথরের গায়ে আঘাতে আঘাতে যা

মূর্ত করা হ'লো, তা কি শিল্পীর ভাব-কল্পনার সার্থক এবং সঠিক রূপায়ন? যে কোনো সৃষ্টির আড়ালে কান পাতলেই শোনা যাবে শিল্পীর চাপা দীর্ঘশ্বাস। শিল্পীর এই অশান্তি, এই অতৃপ্তিই তাঁকে গতিশীল রাখে; সবসময়েই শিল্পীর মনে হয়, তিনি যা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, তার সবটা হয়ে ওঠেনি; ভাবনার আদর্শ রূপায়নে কিছু ঘাটতি থেকে গেল,—শিল্পীর এই ক্ষোভ বা আকুতিকেই বিষ্ণু দে বিশেষিত করেছেন—'কাঁসাই যন্ত্রনা'-য়; আর রিলকে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন, কেননা—'*the permanent eludes us all*'—। নিরাকার মাটি ও কাদাকে শৈল্পিক আকার দেওয়া, বিচ্ছিন্ন, পরাধীন শব্দাবলীকে ভাবনা এবং ছন্দের আঙ্গিকে মুক্তি কিংবা স্ফূর্তি দেওয়া; বিখণ্ড, বিমূর্ত, ব্যবহারের অযোগ্য পাথরের গায়ে ছেনি ও বাটালি দিয়ে আঘাতে আঘাতে সুন্দরকে মূর্ত করা,—এই হ'লো শিল্পীর কাজ। 'কবিতার স্বপক্ষে' রচনায় শেলী কবিতাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এইভাবে—'*Poetry turns all things to loveliness; it exalts the beauty of that which is most beautiful, and it adds beauty to that which is most deformed*'। সুতরাং 'পুতুল' কিংবা শিল্পকর্মের নিখুঁত পূর্ণতায় বা বিশুদ্ধতায় উত্তীর্ণ হবার ওপরেই নির্ভর করে শিল্পীর 'সব কিছু'—কুমোরের সন্তোষ এবং সাফল্য, শিল্পীর বা কবির তৃপ্তি কিংবা আনন্দ।

দ্বিতীয় স্তবকের শেষ তিনটি পঙ্‌ক্তি এবং আরো একটি পঙ্‌ক্তির খণ্ডাংশ—[ঝলসে ওঠে যেন—] বেশ কঠিন এবং গভীরভাবে অর্থ-দ্যোতনায় সমৃদ্ধ ব'লে আমার মনে হয়েছে। 'আঙুলের টানটোনে সমস্ত হৃদয় ঝ'রে যায়,'—'টানটোন' শব্দটি নিপুণ দক্ষতায় ব্যবহৃত। এই একটি শব্দের ভিতরে অবরুদ্ধ আছে কুমোরের মাটি-লেপার পরিশ্রমী ও সচল একটি চিত্রকল্প। কিন্তু 'সমস্ত হৃদয় ঝ'রে যায়'? পাতা ঝ'রে যায়, জল ঝ'রে পড়ে;—হৃদয়ও ঝ'রে যায় নাকি? হৃদয় তো কোনো আকারপ্রাপ্ত বস্তু নয়; হৃদয় এক ভাবনা, এক রূপকল্প, কিংবা চিত্রকল্পও বলা যায়। 'ঝ'রে যায়'-এর তীব্র কবিত্ব আমাদের বিদ্ধ করে, স্পর্শ করে। আবার আমাদের মনে পড়ে যায় রিলকে-র একটি কবিতা, —যেখানে হেমন্তের পাতা ঝরা আর পাতা ঝরার ছবির সমাহারে কবি প্রকাশ করেন এক মহাবোধকে,—

We are all falling. This hand's falling too—
all have this falling sickness none withstands.

মনে প'ড়ে বুদ্ধদেব বসু অনুবাদ করেছিলেন—'এই হাত তাও ঝ'রে যায়....'। রিলকে এখানে মৃত্যুর ইঙ্গিত দিয়েছেন, অনিবার্য নশ্বরতার কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। আর প্রণবেন্দু বলেছেন—নিরলস, নিরন্তর, কঠিন সংগ্রামের মধ্যে

শিল্পীর শেষ হ'য়ে যাওয়ার কথা। এলিয়ট বলেছিলেন—'কবিতা রচনা হল রক্তকে কালিতে রূপান্তরের যন্ত্রনা।' আজীবন অবিবাহিত—ইঙ্গমার বার্গম্যান, প্রসিদ্ধ চিত্র-পরিচালক, —এক সরস মন্তব্যের সাহায্যে শিল্পীর এই প্রাণপাত পরিশ্রমের কথাই প্রকাশ করতে চেয়েছেন—'যে স্ত্রীকে আমি ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছি, সে একাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। সর্বক্ষণ আমাকে ব্যস্ত রেখেছে এক বিরতিহীন সংগ্রামে। সে হল আমার শিল্প। আর আমার কাজগুলোই হল আমার সন্তান।' শিল্পীদের এইসব অভিজ্ঞতাই যেন কেন্দ্রীভূত হ'য়ে আছে 'হৃদয় ঝ'রে যায়'-এর চিত্রকল্পে।

'হৃদয়ের সঙ্গে, দ্যাখো, গ্রহ-তারা-অনন্ত আকাশ বাঁধা থাকে,'—স্পষ্টতই প্রণবেন্দু এখানে শিল্পীর চেতনার সঙ্গে প্রকৃতি কিংবা সামগ্রিক জগতের 'যোগাযোগ'-এর কথা ভেবেছেন। প্রসঙ্গক্রমে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, 'যোগাযোগ' শব্দটি প্রণবেন্দু-র কবিতায় এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রায়শই এই শব্দটি তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত হয়। যেমন— (ক) 'অন্ধ প্রাণ, জাগো, জেগে ওঠো। / সমস্ত পৃথিবী আজ শুধুই তোমার জন্যে তৈরী হয়ে আছে। / তুমি যোগাযোগ করো।' (খ) 'কোথাও কি সের একটা যোগাযোগ আছে, নইলে এভাবে / আমরা কেঁপে উঠি কেন?'

আবার অন্য একটি কবিতায় তিনি আরো স্পষ্টভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগসূত্রের ঔচিত্যের কথা এইভাবে বলেন—'মানুষকে মানুষের কাছে যেতে হ'লে / সমস্ত পাঁচিল আজ ভেঙে ফেলতে হবে। / একজন এগিয়ে গেলে, আরো একজন হয়তো কিছুটা এগোবে।' হৃদয় কিংবা চেতনার সঙ্গে বিশ্বজগতের মিলন ঘটলে, তবেই শিল্পীর দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়। রবীন্দ্রনাথও একটু অন্যভাবে এই মহাজাগতিক যোগসূত্রের ইঙ্গিত দিয়েছেন তাঁর গানে ও কবিতায়ঃ 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয়, এই আকাশে....'। পরের পঙ্‌ক্তির 'ঝলসে' শব্দটির নিখুঁত প্রয়োগ যেন সত্যিই মুহূর্তের বিদ্যুত ঝলকের মতো আমাদের কল্পনাকে জাগিয়ে দিয়ে যায়। আমরা উপলব্ধি করি, প্রণবেন্দু এখানে সৃষ্টির অনুপ্রেরণাকেই ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন। গ্রহ-তারা-অনন্ত আকাশের সঙ্গে শিল্পীর যোগাযোগ যখন সম্পূর্ণ হয়, তখনই আসে সৃষ্টির মুহূর্ত,—'যে জীবন স্পন্দমান, তার গুঢ় টেলিফোন / স্নায়ু ছুঁয়ে, মন্ত্রের মতন বেজে যায়।' অন্যত্র প্রণবেন্দু এই সৃষ্টি-মুহূর্তে-কেই ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে—'এলিয়ট ব্যবহৃত '*Still Centre*', সেই স্থির বিন্দু যা আপাতর্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং, কোনো বিক্ষোভ যার বেলাভূমিকে লঙ্ঘন করে না।'

সেই 'দৃষ্টি', যা বস্তুত শিল্পীর বিশ্ববীক্ষা, 'মৃত্যু কিংবা পরাজয় কিছুই মানে না, / শুধু দেখে নিতে চায়, দেখে নিয়ে বুঝে উঠতে চায় / কিভাবে একটা ফল পেকে ওঠে, কমলা-গোলাপী / কোন্ রং ফুটে ওঠে আমের বোঁটায়'। র‍্যাঁবো কবিকে বা শিল্পীকে যখন বলেছেন—'*Seer*' বা দ্রষ্টা, তখন তিনি এই দিব্যদৃষ্টির কথাই বলতে চেয়েছিলেন, যা আরো বিস্তৃতভাবে তিনি বলেছেন এভাবে—'*The poet turns himself into visionary by a long, drastic and deliberate disordering of all his senses.*'—এই দৃষ্টি লাভ করার পর প্রণবেন্দুও গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আমাদের জানান অন্য একটি কবিতায়—'আমি আজ পুরো পৃথিবীকে খুব স্পষ্টভাবে দেখতে শিখেছি।' কিন্তু এই দিব্যদৃষ্টির অধিকারী হবার জন্য শিল্পীকে জীবনের বহু স্তর পেরিয়ে আসতে হয়, পেরিয়ে আসতে হয়—'অনেক যন্ত্রণা, দুঃখ, অনেক অদ্ভুত কানাগলি—' ; 'চারপাশে নানারকমের সব ভৌতিকতা',.... 'কখনও প্রকাশ্যভাবে, কখনও গোপনে।' আর মৃত্যুকে উপেক্ষা করে, পরাজয়কে দু-হাতে ঠেলে সরিয়ে, শিল্পী যখন 'ঠিক জীবনের মাঝখানে' এসে উপস্থিত হন, তখন তিনি অর্জন করেন এক মহাবোধি, —যা নিরাসক্ত এবং নৈর্ব্যক্তিক ; তখন শিল্পীর শুধু অনন্ত জিজ্ঞাসার দিকে হেঁটে যাওয়া, তখন তিনি 'সংসারে এক সন্ন্যাসী', 'দুদিকে সংসার রেখে / সচ্ছল নদীর মতো মাঝখান দিয়ে' চ'লে যাওয়া শুধু। এবং ঠিক তখনই কবি সি-ডে-লুইসের মতো, যে কোন শিল্পী অক্লেশে বলতে পারেন—'*For me there is no dismay / though ills enough impend*'—। নিরাসক্ত, নৈর্ব্যক্তিক, প্রসারিত এই অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে বস্তুর দিকে চেয়ে থাকা শুধু, বুঝে নিতে চাওয়া বস্তুর প্রকৃত আত্মাকে। প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে যায়, কবি রিলকের জীবনের সেই বিশেষ অধ্যায়ের কাহিনী। তখন তিনি রঁদার সেক্রেটারি। লিখতে পারছেন না কিছুই। যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত রিলকে একদিন রঁদাকে জিজ্ঞাসা করলেন এই সমস্যা থেকে মুক্তির উপায়। উত্তরে রঁদা উপদেশ দিলেন—'নিরন্তর কাজ করো।' এবং তারপর আরো উদ্দীপ্ত করলেন এভাবে—'*Why don't you just go and look at something—for example, at an animal in the 'Jardin des Planets,' and keep on looking at it till you're able to make a poem of it?*' এই উপদেশের ফলশ্রুতি হ'ল, রিলকের কবি-জীবনের এক নতুন বাঁকের সূচনা ; আর সেই বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে তাঁর রচিত চাবি-কবিতা—'চিতাবাঘ'।

একজন শিল্পী বা কুমোরের কথা না ব'লে, প্রণবেন্দু কয়েকজনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন কেন, তাও একটু বিশ্লেষণ করা দরকার আছে মনে হয়। প্রণবেন্দু বিশ্বাস করেন—সৃজন একটি সামাজিক কর্ম, —'a social act of a

lonely man'। সমষ্টির একত্র প্রচেষ্টায়, অনেকের মানসিক যোগাযোগের ফলেই সৃষ্টি হয় সেই শিল্পের যা অনেকের এবং সমাজের। একাধিক কবিতায় প্রণবেন্দু তাঁর এই ভাবনাকে প্রকাশ করেছেন—

ক 'এসো, আমরা একসঙ্গে দুর্গ তৈরী ক'রে থেকে যাই।
এসো, আমরা বুক বেঁধে গান গেয়ে উঠি।'

খ 'একজন গান গাইলে, আরো একজন তার পায়ের সমস্ত ঠাম
নাচের মুদ্রায় বেঁধে নেবে।
জ্যোৎস্নায় উৎসব হবে; জ্যোৎস্নার ভেতরে
সব মানুষ-মানুষী
মাটি-পৃথিবীর মতো ক্রমশ সহজ হ'য়ে উঠবে কখনও।'

বস্তুত, কবিতাটিতে খুব সংক্ষিপ্তভাবে, কিন্তু অপার ইঙ্গিতময়তায় সৃষ্টি-পদ্ধতির কাহিনীই বিবৃত করার প্রয়াস আছে। তাই কবিতার শেষে এসে 'কাহিনী' শব্দটির ব্যবহারও যেন আরো সম্মত মনে হয়।

কবিতাটির শেষ তিন পঙ্‌ক্তি—'শূন্য থেকে মুক্তি চাই। / শূন্য থেকে আমাদের পরিত্রাণ চাই। আমাদের একটা কিছু গ'ড়ে যেতে হবে।' —প্রথম স্তবকের দুটি পঙ্‌ক্তির বিশদ পুনরাবৃত্তি। পুনরাবৃত্তি, কিন্তু এটা লক্ষণীয় যে উচ্চারণ এখানে অনেক বেশি পরিণত, আত্মবিশ্বাসে দীপ্ত এবং স্থিরপ্রতিজ্ঞ। যেন কবির মনে এই বক্তব্যের ব্যাপারে এখন আর কোনো দ্বিধা বা সংশয় নেই। শেষ স্তবকের প্রথম দুটি পঙ্‌ক্তির পর পূর্ণচ্ছেদ; তৃতীয় ও শেষ পঙ্‌ক্তির পর দুটি পূর্ণচ্ছেদ। অর্থাৎ এখানে যা বলা হ'ল, তা এক দৃঢ় সিদ্ধান্ত। এবং প্রতিশ্রুতি। শূন্যতা থেকে, কর্মহীন, উদ্যোগহীন, অর্থহীন অস্তিত্বের কূপমন্ডুকতা থেকে মুক্তি কিংবা পরিত্রাণের উপায় আরো বিশদ ও স্পষ্টভাবে বিবৃত করেছেন প্রণবেন্দু 'অন্ধ প্রাণ জাগো' কবিতায়।

ক. 'তোমাকে তো দীর্ঘদিন কাজ করে যেতে হবে।'

খ. 'হে প্রাণ, হে অন্ধ, বিমূঢ় প্রাণ তুমি জেগে ওঠো।
তোমার অনেক কিছু করণীয় আছে।'

গ. '....জেগে ওঠা মানে
এক অসীম দায়িত্ব নিয়ে বেঁচে থাকা।
প্রতিটি মুহূর্তে কিছু না কিছুর জন্যে
তৈরী হয়ে থেকে, তারপর আজীবন
তার জন্য পরিশ্রম করা।....'

আবারও বলছি প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের জীবনদর্শন এবং শিল্পবোধ বুঝে নেওয়ার ব্যাপারে আলোচিত কবিতাটির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

'স্তব্ধ পাতার দিকে ঝুঁকে পড়ি একা' ঃ প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের পাঁচটি কবিতা

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

প্রণবেন্দুর কবিতায় শব্দাশ্রয়ী এক আবহ ছড়িয়ে আছে যা কিনা প্রায়শই আমাদের নিবিড় নৈঃশব্দের খুব কাছে দাঁড় করিয়ে দেয় অনায়াসে, আমরা দেখি স্তব্ধতায় ক্রমশ নিবেদিত হতে চাইছে তাঁর উচ্চারণ, সামনে কাউকে রেখে যেন মৃদু ভঙ্গিতে তিনি তাকেই সম্বোধন করছেন আগাগোড়া, অথচ সে নির্বাক, আর এরই ফাঁকে গড়ে উঠছে স্বগতোক্তির নিটোল মুহূর্তমালা। বাকস্পন্দে কোনও অনাকাঙ্ক্ষিত জটিলতা নেই, আবার যে সারল্য জড়িয়ে রয়েছে তাঁর নির্মাণ ঘিরে, তাও এক আপাতসরলতা, যার স্বাদে অতলান্ত, গভীর অথচ লাবণ্যময় মগ্নতা নিয়ে তিনি নাড়িয়ে দিতে পারেন পাঠকের বেদনা-সংবেদনার জগত। কবিতায় তুচ্ছ উপকরণকে অসামান্য স্তরে উত্তীর্ণ করে দেওয়ার জন্য তাঁর একটা সৎ প্রতীক্ষা আছে, এবং সেই প্রতীক্ষাকে সার্থক করে তোলার জন্য কতটা অকম্প্র, নিরুত্তেজ থাকতে হয়, তা তাঁর জানাও আছে পুরোমাত্রায়। একাকিত্বে সমর্পিত হয়ে তাঁর এই প্রতীক্ষা, আর তার অবসানেই তিনি অতিনিজস্ব এক আঙ্গিকে স্থাপন করে নিতে চান বিষয় ভাবনার সমূহ সম্ভাবনা। সন্ধ্যেবেলায় কার্নিসে-বসা একটি কাকের নিস্তব্ধ নিরুদ্দেশের দিকে যাত্রা, শীতের দুপুরে পাঁচিল থেকে লাফ-দেওয়া একটি বেরালের চকিতে অদৃশ্য হওয়ার দৃশ্য, পার্কে প্রেমিকের পাশে একজন তরুণীর সবুজ ঘাসের ওপর বসবার ভঙ্গিটুকু কিংবা সাইকেলে চ'ড়ে একদল যুবকের উদাস রাস্তার আড়াল দিয়ে হারিয়ে যাওয়া,—এই সমস্ত 'ছোট ছোট ঘটনায় কম্পমান হয়ে ওঠে অন্য একটি যবনিকা, আবরণ,—যার আড়াল থেকে নির্গত হয় এক ধরনের রহস্যানুভূতি।' ১৩৮৭-র 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যায় 'কবিতা ও আমি' নিবন্ধে নিজের কবিতার উপজীব্য সম্পর্কে লিখতে লিখতে এই 'রহস্যানুভূতি'কেই তিনি বলতে চেয়েছিলেন 'আধ্যাত্মিক আয়তন', যা আমাদের জীবনে আকীর্ণ হয়ে থাকে, অথচ যে-বিষয়ে আমরা মাঝে-মাঝে অনবহিত হওয়ার ভান করি।

শুরু করেছিলাম যে কথা দিয়ে, প্রণবেন্দুর প্রিয়তম আবহ, শব্দ আর শব্দহীনতা দিয়ে গড়া তাঁর একান্ত বাতাবরণের কথায় আবার ফিরে আসি। ফিরে আসতে হয় কারণ প্রণবেন্দুর কবিতায় যে স্নিগ্ধ নির্জনতার দেখা পাই আমরা, যেখানে তাঁর শব্দের জগত আস্তে আস্তে আত্মস্থ হয়ে যায় নিবিড় নৈঃশব্দে, ব্যক্তিগত শব্দহীনতায়, আর তার থেকে উদ্গত উচ্চারণ নিয়ে ভরে ওঠে তাঁর কবিতার মুহূর্ত, সে-সব কিছুর অন্যমাত্রিক চরিত্র আছে, গভীর এক ব্যক্তিত্ব আছে, আছে হয়ত বা

একটা মূর্ত শরীরও। আলোচনার জন্য যে পাঁচটি কবিতা নির্বাচন করেছি—'অন্য কবিতার প্রতীক্ষা', 'কবিতার জন্ম', 'সাতদিন পর', 'কার জন্যে' এবং 'স্তব্ধ নদী',—তার প্রত্যেকটির মধ্যে প্রণবেন্দুর চরিত্রময় আবহ গড়ে তুলছে সেই চালচিত্র যা থেকে আমরা অনায়াসে সনাক্ত করে নিতে পারি তাঁর কবিতার এক নিজস্ব ভুবনকে আর যে ভুবনের নির্মাণে ওই পাঁচটি কবিতার মধ্যেই বড় আকস্মিকতায়, সম্ভবত কাকতালীয়ভাবেই, উল্লেখ ঘটে গেছে মানবেতর কোনও কোনও প্রাণীর। একটি নিঃসঙ্গ কাক কিংবা একটি দুঃখী বাদুড় অথবা শিশু কাঠবেরালী নয়তো 'গাভীর মতন নীরবতা'—এরা ঘিরে আসে কবিতার বিষয়বীজ ছুঁয়ে, এসে খুলে দেয় নির্জনতার এক-একটি স্পর্শপ্রবণ স্তর, আর মিতকথনের সৌজন্যে আমাদের চোখের সামনে উন্মোচিত হয় কবির আবেগকাতর এক জগত। আমরা বুঝে নিতে পারি আকাঙ্ক্ষিত উচ্চারণের জন্য কবিকে প্রতীক্ষায় থাকতে হয় মাঝে-মাঝেই, কবিতা লেখার মুহূর্ত থেকে তাঁর কবিতা না-লেখার মুহূর্ত অনেক দূরে থাকে না কখনোই, কিংবা স্তব্ধতায় সমর্পিত হলেই একটা সময় ঘনিয়ে আসে কবিতার ঘোর, সম্ভাবিত হয়ে ওঠে তাঁর পঙ্‌ক্তিময় নিবেদন, উপলব্ধি দাবি করতে থাকে অনিবার্য উচ্চারণ।

'নিজস্ব ঘুড়ির প্রতি'-র প্রকাশকাল ছিল ১৯৭৫, তারই অন্তর্গত প্রথম নির্বাচন 'অন্য কবিতার প্রতীক্ষা'। দুটি স্তবকে বিধৃত একটি নিটোল নিবিড় লিরিক উপস্থাপনা ঃ

ধ'রে ধ'রে কবিতা লেখার হাত
ভেঙে যায়, থাকে শুধু গাভীর মতন নীরবতা।
দাঁত-করাতেরা সব বনের ভেতর থেকে শিস্ দিয়ে ওঠে—

কবিতা কি তার মতো? মৃদু ও অমোঘ? অবারিত

বুকের ভেতর থেকে বুকের বাইরে আলো ধরে?
ঝরা-পাতা ঠেলে তার ভাঙা সাইকেল নিয়ে এসেছে যুবক,
সে কি সিগন্যাল করে কবিতায়? করে কি জোনাকি?
ধ'রে ধ'রে কবিতা লেখার হাত থেমে যায়,
থেমে যায় ফাঁকি।

ভয় হয় এ কবিতাকে কোনওভাবে ব্যাখ্যা করতে গেলে বুঝি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এর বাঙ্ময় নিস্তব্ধতা। আর কোনও কোনও সংবেদী কবিতা সম্পর্কে একটু ভয়ই বোধহয় থাকা দরকার পাঠকের তরফে। কবিতা কিসের

মতো? এ প্রশ্নের সরাসরি কোনও উত্তর যোগাতে পারেন কি কবি নিজেও? পারেন না বলেই তো শুধু জাগিয়ে তোলেন দুটি প্রশ্ন : গভীর মতন নীরবতায় কিংবা বনের ভেতর থেকে দাঁত-করাতের শিস্ দিয়ে ওঠার মধ্যেই কি গোপন রইল কবিতার নিজস্ব স্বভাব? কোমল আর অমোঘ এই স্বভাব? বুকের গভীরে জমে ওঠে যে বর্ণমালা, তারই প্রতীক্ষিত প্রকাশ তো উচ্চারণে। আর সে উচ্চারণ উপকরণ খুঁজে ফেরে কখনও প্রকৃতির বুক থেকে, কখনও জাগতিক দৃশ্যমালা থেকে। কবির কাছে নির্মাণের সংবাদে তুচ্ছ উপজীব্যও অনাদৃত নয়। ঝরা পাতায় বিছানো পথ অতিক্রম করে যে যুবকটি তাঁর সামনে দৃশ্যগোচর হল তার ভাঙা সাইকেলটি নিয়ে, কিংবা অন্ধকার চিরে যে জোনাকির ঝাঁক ফুটে উঠল চারপাশের উপত্যকায়, সবই বিষয়বস্তু হতে পারে কবির হাতে। যুবক না জোনাকি, কার কাছ থেকে মিলবে কবিতার চূড়ান্ত সিগন্যাল, কবি নিজেও হয়ত জানেন না; জানলে হয়ত সেখানেই ধরা পড়ে যায় কবিতার ফাঁকি, তার অনান্তরিকতা। আর সেই মুহূর্তেই, কবিতাটির সূচনায় যেমন, সমাপ্তিতেও তেমনি, কবিকে নিরুপায় অসহায়তা নিয়ে বলে উঠতে হয়,

ধ'রে ধ'রে কবিতা লেখার হাত থেমে যায়—

উদ্বোধনে ছিল 'ভেঙে যায়', সেখান থেকে কথা গড়িয়ে যাবার অবকাশে যে এইটুকু পরিবর্তন, সেটাই চিনিয়ে দেয় কবির গোত্র, 'ফাঁকি' উদ্ঘাটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে সত্যেরও অবসান, শুধু নিছক ভাঙন নয়, তাই যেন সূচিত হয় বদলে যাওয়া এই দুটি পঙ্‌ক্তির সূত্রে। কত সহজ এই পরিবর্তন, কতই না স্বতঃস্ফূর্ত, কিন্তু যিনি শুরু আর শেষে এই বদল ঘটান তিনিই জানেন ঈষৎ এই প্রক্রিয়াটুকুর মধ্যেই সব্যঞ্জনায় মুদ্রিত রইল কী গভীর অর্থ-অন্বেষার সাক্ষর। এইভাবেই সূচনা আর অবসান অবিকল্প অনিবার্যতায় জড়িয়ে থাকে একটি কবিতার নিগূঢ় নির্মাণে।

দ্বিতীয় কবিতা বিশ্লেষের আগে আরও দু-একটা কথা সেরে নেওয়া যাক। 'প্রত্যেক প্রধান কবিরই নিজস্ব জগৎ ঘর গেরস্থালি থাকে, সাইকেল থাকে, আরো অনেক কিছু থাকে, lietmotif থাকে'—অনেকদিন আগের অধুনালুপ্ত 'শতভিষা' কবিতাপত্রের এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে নিজের পৃথিবী সম্পর্কে এমন কথাই জানাচ্ছিলেন প্রণবেন্দু। একটা চিহ্নিত ভুবন থেকে কাম্য আবহ গড়ে তুলতে তুলতে কিভাবে আর কখন একজন কবি ঢুকে যান কবিতার অন্দরে, আমরা জেনে নিচ্ছিলাম তাঁর সেই স্বিরালাপ থেকে। আর জেনে নিতে নিতে আমাদের চোখ পড়ে যাচ্ছিল তাঁরই আরও কিছু কবিতার ওপর, আমরা স্বান্তিবোধ করছিলাম

এইটুকু দেখে যে যা তিনি বিশ্বাস করেন কথায়, তার থেকে লেখায় বিচ্যুত হতে তিনি ভালোবাসেন না এতটুকু। তাঁর প্রতীকে, অনুষঙ্গে, বিষয়নির্বাচনে তিনি আপোষহীনভাবে সৎ,

মুখে খড়কুটো নিয়ে যে পাখি এসেছে, তার কাছে,
সাইকেল নামিয়ে রেখে যে ছেলে আসছে, তার কাছে,
যে ভাঙা-বিনুনি নিয়ে দৌড়ে গেল, আজ তারো কাছে
আমি করজোড়ে বলি : এসো কাছে এসো। (অন্ধকারে আরো কাছে এসো)

পশুপাখি নিয়ে খুব ভালো থাকি—অথচ বিকেলে
বিশুদ্ধ প্রতীক হয়ে ওরা আসে কবিতার দিকে।
আমি বাধা দিই, বলি : 'সরাসরি এসো,
সবাই নিজস্ব হও নিজের নিরিখে।' (পশু, পাখি এবং মানুষ)

একদিন চিল এসে ঝাঁপ দিয়েছিলো।
বারান্দার দেয়ালে-দেয়ালে হঠাৎ বিশাল ছায়া দেখে
তুমি একছুটে এসে, আমার পায়ের কাছে ঘর চেয়েছিলে।
যা বলার, তা তুমি নিঃশব্দে তাকিয়ে তাকিয়ে
আমাকে বলেছো।
মনে রেখো, আমি সব বুঝতে পেরেছি।

পোষা খরগোশ,
একদিন আমিও তোমার মতো বোবা হতে চাই। (পোষা খরগোশের প্রতি)

নৈঃশব্দ থেকে আরও নিবিড় শব্দহীনতায় মগ্ন হওয়ার জন্য প্রণবেন্দুর কবিতা এভাবেই বেছে নেয়, বেছে নিতে জানে মুখে খড়কুটো নিয়ে উড়ে আসা একটি পাখিকে, সাইকেলে চড়া যুবক কিংবা বিনুনি-চুলের কোনও কিশোরীকে; ভীরু কোনও খরগোশ, চকিতে দেখা বেরাল কিংবা বিষণ্ণমুখ একটি কাকের জন্যও তাঁর কবিতা প্রকাশউন্মুখ হয়ে ওঠে, কখনও তাদের সরাসরি, কখনও তির্যক অভিঘাতে চিত্রকল্পিত হতে চায় বিষয়ভাবনা, কখনও প্রত্যক্ষতায় কখনও প্রতীকে আশ্রয় নেয় তাঁর ভঙ্গি।

১৯৭৭-এ প্রকাশিত 'হাওয়া, স্পর্শ করো' গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত আমার দ্বিতীয় নিবেদন 'কবিতার জন্ম',—

আমি সব টের পাই!
আলিসায় একা কাক মুখে ভাঙা অন্ধকার নিয়ে

বসে আছে, তার ডানার ঝাপট
সোজা বুকে এসে লাগে।

সে কি জানে, সে আমাকে একটু একটু ক'রে
শব্দ ও ভাষার দিকে নিয়ে যায় ?
এভাবে সংকেত করে সব কিছু—আমি লুফে নিই
যা কিছু খবর, বার্তা, প্রতিটি মুহূর্ত জুড়ে
যা আমাকে রশদ পাঠিয়ে চলে আজীবন।

কাক উড়ে যায়, আমি আমার কলম নিয়ে
স্তব্ধ পাতার দিকে ঝুঁকে পড়ি একা।

প্রথম পর্বে একটি কাকের উপবিষ্ট ভঙ্গি এবং অন্তিমাংশে তার উড়ে যাওয়ার মধ্যবর্তীকালীন মুহূর্ত থেকে জন্ম নিচ্ছে এ কবিতা, জেগে উঠছে এর উপকরণ। এত সামান্য থেকেও অসামান্যতায় পা ফেলতে পারেন একজন কবি তাঁর কবিতার ভূমিতে দাঁড়িয়ে। পরিপার্শ্বের সব কিছু টের পান তিনি, আপাতনগণ্য ঘটনা-সংক্রামও ছায়া ফেলে তাঁর ওপর, তাঁর মনের ওপর, তাঁকে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসতে দেখি অনুভবোত্তর প্রকাশের দিকে, প্রকাশভঙ্গির দিকেও। ভেঙে খান খান হয়ে যাওয়া যে অন্ধকার সেই নীরন্ধ্র অন্ধকার মুখে নিয়ে আলসেতে নিশ্চুপ বসে আছে কাক, তার ডানার ঝাপটে যে বিষণ্ণতা, যে একাকিত্ব, তা মুহূর্তে বিদ্ধ করে কবির মন। কম্পমান হয়ে ওঠে তাঁর সজাগ অনুভূতি, যবনিকা উঠতে থাকে ক্রমশ, ক্রমশই ঘনতা পায় এক রহস্যের আবরণ। মনে পড়ে যাচ্ছে তাঁর নিজেরই কথা, বলছিলেন তিনি ১৯৮৫-র 'কৌরব'—৪৩ সংখ্যায়,

> রাতবিরেতের মাঠের পাশ দিয়ে হুহু ট্রেন চলে গেলো। একটা বেরাল কেঁদে উঠলো কোথাও। আমি শুনতে পেলাম। যেন একটা ঢেউ আস্তে আস্তে গড়িয়ে এলো বালির ওপরে। আমি কি কেঁপে উঠবো না ? আমিও তো মানুষ। কেন কাঁপবো না ? আমার কবিতা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হবার মুহূর্তে, আর তার আগের কিছুক্ষণের ঘনায়মানতা।

এইরকম একটা বিদ্যুৎবাহিত ঘনায়মানতা থেকেই ওপরের 'কবিতার জন্ম' কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকে উঠে আসে একটি অমোঘ প্রশ্ন,—'সে কি জানে.... ?' কবিতাটির নিহিত সত্য ও প্রচ্ছন্ন উত্তর লুকিয়ে থাকে ওই প্রশ্নের আড়ালেই। নিঃসঙ্গ, বিষণ্ণতায় ম্লান ওই একটি কাকই তাঁকে শব্দাশ্রয়ী করে তোলে, হয়ে ওঠে তাঁর প্রত্যক্ষ ভাষাদাতৃ। নিস্তব্ধতার এবং নিঃসঙ্গতার সংকেত থেকেই কবি কুড়িয়ে নিতে

থাকেন তাঁর কবিতার উপচার, মুহূর্তকে জড়িয়ে নিয়ে গড়ে ওঠে যে সংবাদপ্রবাহ, যে বার্তার তরঙ্গমালা, তাতেই স্পন্দিত হতে থাকে কবির যাবতীয় অনুভাব, এবং আজীবনের উপকরণ যেন সঞ্চিত হয়ে যায় ওই তুচ্ছ একটা মুহূর্তের নির্যাস থেকেই। কাকটি যতক্ষণ দৃষ্টিগ্রাহ্য ছিল, প্রত্যক্ষগোচর ছিল, সে এক মুহূর্ত, দৃশ্য থেকে হারিয়ে যাবার পর মুহূর্তটি হয়ে গেল উপহারের থেকেও মহার্ঘ। এই উপহার, এই মহার্ঘই কবিকে হাত ধ'রে নিয়ে যায় নির্মাণের দিকে, উচ্চারণের উৎসের দিকে। স্তব্ধ শুভ্র একটি পাতার বুক অক্ষরবিদ্ধ হতে থাকে, কবি ঝুঁকে পড়েন তাঁর সম্ভাব্য প্রকাশভঙ্গির ওপর, পাণ্ডুলিপির ধূসরতা চিরে জেগে ওঠে শব্দের সারি।

এরপর কি টানা সাতদিন কবিতা থেকে দূরে থাকতে হয় তাঁকে, তৃষিত প্রত্যাশা নিয়ে নিষ্ফল সময় কাটাতে হয় উপায়হীন অসহায়তায় ? তেমন সংবাদই পাচ্ছি আমাদের পরবর্তী নির্বাচিত 'সাতদিন পর' কবিতাটিতে। এটিও 'হাওয়া, স্পর্শ করো' থেকে মনোনীত।—

সাতদিন কবিতা লিখিনি।
এই ফাঁকে, নর্দমার জল বেড়ে গেছে।
হেলিকপ্টার গেছে মেঘের অনেক নিচু দিয়ে
আরেক আকাশে।
যাদবপুরের মোড়ে, ছেলেরা হৈচৈ ক'রে
শান্ত হ'য়ে গেছে।
আরো হয়তো ঢের কিছু ঘটে গেছে—
আমি সব বুঝতে পারিনি।

সাতদিন কবিতা না লিখতে বসার কষ্ট
বুকে বিঁধে আছে। এখন প্রস্তুত হই,
মনে মনে বলি : তৈরী হও,
শুকনো পাতা চ'লে যায় উত্তরে-হাওয়ার পিছু পিছু,
তুমি সেইভাবে যেন ছড়িয়ে প'ড়ো না—
বরং, গর্তের ভেতর থেকে যেভাবে বাদাম এনে
কাঠবেরালীর শিশু শব্দ ক'রে খোসা ভেঙ্গে ফেলে,
তুমি সেইভাবে আজ শব্দ ভেঙ্গে শব্দের ভেতরে চ'লে যাও,
এখন, অষ্টম দিনে লিখে ফেলো একটি কবিতা।

লেখার মধ্যে নিরন্তর বহতা মেজাজে চলতে থাকে লেখা, আর না-লিখতে-পারার মুহূর্তেও বুঝি আড়ালে-অন্তরালে সক্রিয় হতে থাকে প্রচ্ছন্ন প্রস্তুতির এক পালা। ইতিমধ্যে দৃষ্টির অগোচরে থেমেও থাকে না বহির্জগতের নানাবিধ আয়োজন। সাতদিনের নির্জলা অক্ষমতার সঙ্গোপনে নর্দমার জল বেড়ে যায় মেঘস্তরের নিচু দিয়ে হেলিকপ্টারের অপসৃয়মান দৃশ্যের ফাঁকে আকাশ বদলে ফেলে আকাশের চেহারা। আর রাস্তার আবহপটেও অন্য চরিত্র, পথচারী ছেলেমেয়েদের উচ্চরোল কলগুঞ্জনের পর পরিপার্শ্ব আপাতত শান্ত, অনুত্তেজিত। বাইরের সঙ্গে সঙ্গে ঘটনা মনোজগতেও ঘটে গেছে কম না, তার মধ্যেও হয়ত ছায়া ফেলেছে কম-বেশি রদবদল, তার অল্পই টের পেয়েছেন কবি, আর যা পাননি তার অভিঘাত প্রচ্ছন্ন কিন্তু প্রবল।

'শতভিষা'-র ঐ সাক্ষাৎকারেই ছিল নিজের কবিতা সম্পর্কে প্রণবেন্দুর এক অভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ: 'আমার কবিতাতে সম্ভবত একধরনের জিনিস থাকে, যাকে পাশ্চাত্য সমালোচকেরা বলেছেন stoff—বা নগ্নতা, অর্থাৎ সবকিছুর বাইরের আবরণ ছিঁড়ে ফেলে ভেতরের অন্তঃসারে পৌঁছুনোর একটা চেষ্টা।' ঠিকই বলছেন প্রণবেন্দু, বাইরের পর্দাটা, তাঁর যে-কোনও কবিতার প্রেক্ষিতে, একটা সূচক মাত্র, নিতান্তই এক উপলক্ষ, সেই পর্দা সরিয়ে সংবেদনার অন্দরমহলে অনুপ্রবেশ-টাই আসল অন্বিষ্ট। আমাদের আলোচ্য কবিতাটিও তার ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত নয়। দ্বিতীয় স্তবক স্পর্শ করতেই আমরা সেই 'ভেতরের অন্তঃসারে' পৌঁছে যাই: কবিতা না লিখতে বসার যন্ত্রণা কবির সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও বিদ্ধ করে প্রচণ্ড। কিন্তু একই সঙ্গে অনুশোচনার পাশে এসে দাঁড়ায় একটা অমোঘ সান্ত্বনা আর অঙ্গীকারের ইঙ্গিত: 'প্রস্তুত হই' এবং 'তৈরী হও'। এটা বাইরের লোককে সম্বোধন করে জ্ঞাপন করার কথা নয়, এ সম্বোধন নিজের জন্য, নিজের কাছে, একধরনের প্রতিশ্রুতিময় স্বগতোক্তি। এই 'প্রস্তুত' হওয়ার মানসিকতা থেকে, এই 'তৈরী' হয়ে ওঠার প্রবণতা থেকেই তিনি এগিয়ে যান নির্মাণের দিকে, এবং এগিয়ে যাওয়ার আগে নিজের কাছে রেখে যেতে চান এক সতর্কবাণী: উত্তরের হাওয়ার পেছনে ধাবমান শুকনো পাতার মত ছড়িয়ে যাওয়াটা যে অনাকাঙ্ক্ষিত, সে সত্য গ্রহণ করে নেন মনে মনে, 'তুমি সেইভাবে যেন ছড়িয়ে প'ড়ো না—'। তারপরেই আসে একটি প্রত্যাশিত অব্যয় 'বরং', সঙ্গে নিয়ে আসে একটি আরও প্রত্যাশিত চিত্রকল্প, যে চিত্রকল্পের মুঠোর ভেতর ধরা থাকে প্রণবেন্দুর টিপিক্যাল অন্ত-র্মেজাজ, শব্দ থেকে শব্দহীনতায় তাঁর আত্মস্থতা, চিত্র থেকে বাকচিত্রে তাঁর উত্তরণ—

বরং, গর্তের ভেতর থেকে যেভাবে বাদাম এনে
কাঠবেরালীর শিশু শব্দ ক'রে খোসা ভেঙ্গে ফেলে,

তুমি সেইভাবে আজ শব্দ ভেঙ্গে শব্দের ভেতরে চ'লে যাও,
এখন, অষ্টম দিনে লিখে ফেলো একটি কবিতা।

'শব্দ ভেঙে শব্দের ভেতরে' চলে যাওয়া,—অসাধারণ এই চিত্রদ্যোতনা। প্রসঙ্গত মনে পড়ে যাচ্ছে তাঁর 'অন্ধ প্রাণ, জাগো'-র দুটি বিশিষ্ট কবিতা, শব্দ থেকে শব্দহীনতায় পৌঁছবার সে দুটি দৃষ্টান্তেও তিনি নিজেকে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন সমমেজাজী অনুষঙ্গের সামনে। কখনও দু'পশলা বৃষ্টির অবকাশে লুকিয়ে থাকে কবিতার স্বপ্ন, কখনও শান্ত নৈঃশব্দের পথ বেয়ে জেগে ওঠে একটি নবজাতক ভোর:

১. "টুং'করে শব্দ হ'লো। একটা রিক্‌শা / গলি থেকে চৌমাথার দিকে চ'লে এলো। / কী মনে করাতে চায় এই শব্দ? কার কথা? কার জন্যে / বৃষ্টি হ'লো? একঘণ্টা পরে / কেন বৃষ্টি থেমে গেলো? / এক ফাঁকে, সব কিছু দেখে নিলো একটি মানুষ, / তারপর কবিতা লেখায় মন দিলো" (দু'পশলা বৃষ্টির ফাঁকে)

কিংবা

২. '....যেন শিশুটি এখন / অন্ধকার থেকে বাইরে যেতে পারে। / যেন ডিম ভেঙে, পাখির শাবক ঠিক শব্দ ক'রে উঠতে পারে / সকালের দিকে' (যে জীবন স্পন্দমান)।

এই শব্দময় শব্দহীনতা পুনরাবৃত্ত হয় তাঁর ভাবনাগ্রন্থনায়, সেই সঙ্গে মাঝে মাঝেই ঘুরে ফিরে আসে সাইকেল, কাক এবং কাঠবেরালীর প্রিয় প্রতীকগুচ্ছ,

ক. শিমলতাটার পাশে সূর্য, প্রায় মোমের মতন নিভে এলো,
বাইসাইকেলে সব ফিরলো ছেলেরা (লণ্ঠনপ্রমাণ আলো)

খ. একটি কাকের শব্দে পুরো পৃথিবীর শান্তি ভেঙে যেতে পারে
(চৌকাঠ থেকে)

গ. তুমি কাছে আছো ব'লে
কাঠবেরালির মতো শরীরের অংশ লাফ দেয় (প্রেমের কবিতা)

বই বদলে যাচ্ছে, 'হাওয়া, স্পর্শ করো'র পর 'মানুষের দিকে,' ১৯৭৭-এর পর ১৯৭৯, কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার গ্রন্থান্তরেও তিনি ভুলতে পারেননি সাতদিনের উপোসি সেই প্রাক্তন কবিতা সপ্তাহটিকে। দু-বছর পরেও যেন সেই ব্যর্থ যন্ত্রণা 'বুকে বিঁধে আছে'। আর আছে বলেই তাঁকে ধিক্কারতাড়িত হয়ে শুরু করতে হয় এইভাবে,

কার জন্যে সাতদিন কবিতা না লিখে
তুমি ব'সে আছো?

এইভাবে কিছুই হবে না।
কোনো জাদু নেই, যাতে এক মিনিটের মধ্যে
সব কিছু সঠিক জায়গায় গিয়ে পৌঁছে যেতে পারে।
তেমন মানুষী নেই, যাকে তুমি সর্বস্ব উজাড় ক'রে দিতে পারো,
তেমন বন্ধু নেই, যে তোমাকে, সমস্ত গুজব ছেঁকে,
ঠিকমতো সাড়া দিতে পারে।

এখন কী ক'রবে, তুমি ভাবো।
সমস্ত পৃথিবী কিন্তু অন্যদিকে তৈরী হ'য়ে আছে।
জারুলগাছের নিচে বেবি-অস্টিনটাকে কিছুটা থামিয়ে
কারা যেন প্রকৃতির শোভা দেখছে।
দুটো মেয়ে দৌড়ুতে দৌড়ুতে এসে, আবার দৌড়ে দৌড়ে
চ'লে গেলো।
একটা ফানুস উড়লো। দুটো কাক। সন্ধে হ'য়ে আসে।

কার জন্যে সাতদিন কবিতা না লিখে
তুমি ব'সে আছো? (কার জন্যে)

সত্যিই কার জন্য কবিতা না-লিখে এই বসে থাকা, কার অপেক্ষায় এই অকারণ সময়ক্ষেপ, নিরর্থক অভিমান? কবিতার শুরু এবং শেষে উদ্গত একই প্রশ্নের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে গেছে তার উত্তর, এবং পাঠকের তরফে সেই উত্তর সন্ধানের অবসরেই জেগে উঠছে কবিতার উপকরণ, কবির পৃথিবী। পৃথিবী বদলে যাচ্ছে, রঙ পাল্টে যাচ্ছে জীবনযাপনের, অলৌকিক মায়াবলে কোনও কিছুই যেন নিখুঁত বিন্যাসে ধরা দিচ্ছে না চোখের সামনে। হয়ত গর্ভীর অসুখেই আক্রান্ত সে। প্রাণান্ত প্রেমনিবেদনের মত মানুষী নেই, 'পরিণামহীন ভালবাসা' হয়ত আমাদের সমস্ত জীবন ধ'রে 'ছায়া ফেলে ছাতিমের মতো'; গুজবকে অবিশ্বাস করে যে বন্ধুতাকে অটুট রাখা যাবে, তেমন একান্ত বন্ধুজনও নেই সংসারে। তবে কি থেমে থাকাটাই শ্রেয়, নৈরাশ্যে সমর্পিত হয়ে স্তব্ধ হয়ে যাওয়াটাই আকাঙ্ক্ষিত? মেলে না উত্তর। তার বদলে মেলে কয়েকটি অনবদ্য পঙ্‌ক্তির সমাহার, আর তা থেকেই আমরা বুঝে নিতে পারি পৃথিবীর কবিতার শেষ নেই, 'the poetry of earth is never dead'। সেই বদলে-যাওয়া নিষ্প্রেম নির্গন্ধিব পরিপার্শ্বেই কবিকে আরেকরকম স্পন্দনে জাগিয়ে তুলতে পারে, 'সমস্ত পৃথিবী কিন্তু অন্যদিকে তৈরী হ'য়ে আছে'। আছে জারুল গাছ, তার নিচে বেবি-অস্টিন থামিয়ে প্রকৃতি-শোভা অপলক দেখে নেবার মত বিরল কিছু মানুষ, আছে দৌড়ে ছুটে এসে আবার দৌড়ে হারিয়ে

যাবার মত প্রাণবন্ত দুটি মেয়ে, আছে আকাশের ফানুস, দুটি কাক, এবং চারপাশের ঘনায়মান শান্ত স্নিগ্ধ সন্ধ্যা। এত মুক্ত উপজীব্য যখন বিকীর্ণ হয়ে আছে বহির্ভুবনে, শুধু দেখার মত চোখ আর সংযত নির্বাচনেই যখন গড়ে ওঠার সম্ভাবনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে একটি কবিতার নির্মাণ, তখন শ্লথ আলস্যে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকবেন কেন কবি? কেন বসে থাকবেন প্রতীক্ষাময় অভিমানের সঞ্জয় নিয়ে, আর কার জন্যই বা? কবির কাজই তো বাজকে গাছের দিকে পৌঁছে দেওয়া। সকাল থেকে গোধূলি পর্যন্ত সে তাকিয়ে দেখবে, তাকিয়েই দেখবে, তারপর একটা সময় বাঙ্ময় হয়ে উঠবে তাঁর সৃষ্টিলগ্ন। এমন কথাই তো একদিন বলতে চেয়েছিলেন 'প্রমিথিউস্ আন্‌বাউন্ড'-এর সেই কবি, 'He will watch from dawn to gloom/The lake-reflected sun illume/The yellow bees in the ivy-bloom,/Nor heed nor see what things they be—/ But from these create he can/Forms more real than living Man./ Nurslings of Immortality!' এইভাবেই জীবন থেকে যা নেবার কুড়িয়ে নেয় কবিতা, এইভাবেই কবিতা একটা সময় ছাপিয়ে যায় সময়কে, জীবনকেও, যাত্রা করে সময়হীনতার দিকে, জীবনতর কোনও জীবনেরই দিকে।

১৯৭৯-র সাত বছর পর 'নিঃশব্দ শিবড়', তারই অন্তর্গত আমাদের শেষ নির্বাচিন 'স্তব্ধ নদী'। এর মাঝখানে ১৯৮৪-তে 'অন্ধ প্রাণ, জাগো'-র স্পন্দমান জীবন এবং প্রকাশ। বছরের ব্যবধান সত্ত্বেও মনে হয় এই কবিতাটি একটি ঘনবদ্ধ সিরিজেরই অংশ, অন্তত এর পাঠ ছাড়া হয়ত অসমাপ্তই থেকে যাবে আমার ওই মনোনীত সিরিজের গ্রন্থনা। কবিতা লেখা এবং লিখতে না-পারার সঙ্গে এবার অন্বিত হয়ে যায় কবিতা না লেখার ইচ্ছে। ঘনিয়ে আসে নির্লিপ্তি, হয়ত বা নির্বেদও। আর সমগ্রের ভাবনায় প্রণবেন্দুর অন্যতম চিত্রকল্প 'বাদুড়' যুক্ত হয় অন্যমাত্রার অর্জনে,

মাঝে মাঝে, কবিতা লিখতে আর ইচ্ছে করে না।
স্তব্ধ বনতল জুড়ে বাদুড় বসেছে—
গাছ থেকে নেমে, মনে হয়। বাদুড়ের দুঃখ
আমি বুঝতে পারি? আমার দুঃখ বোঝে
বাদুড়েরা? এখন সমস্ত কিছু মিশে গেছে ব'লে
আলাদা আলাদা ক'রে কোনো কিছু চেনা যায় না—
শুধু অন্ধকার হ'লে, পৃথিবী ক্রমশ
খুব ছোট হ'য়ে আসে—
আমি বাদুড়ের চোখ লক্ষ্য করি, বাদুড় আমাকে
দেখে কি দেখে না, ঠিক বুঝতে পারে না—

যে স্তব্ধ নদী আজ আমাদের দুজনকে ক্রমশ ভাসিয়ে
তবু স্থির হ'য়ে আছে

তাকে কোন্ উপমায় আমি প্রকাশ্যে জানাবো ?
মাঝে মাঝে, কবিতা লিখতে আর ইচ্ছে করে না। (স্তব্ধ নদী)

কখনও কখনও এমন ইচ্ছেই হয় কোনও কবির, লিখতে লিখতে একসময় আর না-লেখার বাসনা, কেমন যেন ঔদাসীন্য ঘিরে ধরে, ছুঁয়ে যায় এক ব্যাখ্যাতীত অনাসক্তি। ১৯৯১-তে প্রকাশিত প্রণবেন্দুর 'এখন গুজব নেই'। তার শেষ কবিতাতেও ছিল এমনই একটি পঙ্‌ক্তির উদ্বোধন : 'যা লিখেছি, সব টান মেরে ফেলে দেবো ভাবি' (নতুন কবিতা)। আর এ কবিতাটিতেও প্রথম স্তরের সঙ্গে অন্তিম স্তরের যমজ সম্পর্ক, হুবহু অবিকল দুটি ধ্রুব পঙ্‌ক্তি। মাঝখানে রইল নদীর স্তব্ধতা, শুধু অপার অন্ধকার, ক্রমশ ছোট-হয়ে-আসা সান্ধ্য পৃথিবী, দুজনকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার মত জলজ স্থিরতা, আর বাদুড়ের অনবদ্য দুটি অনুষঙ্গ,

১. বাদুড়ের দুঃখ
আমি বুঝতে পারি ? আমার দুঃখ বোঝে
বাদুড়েরা ?

২. আমি বাদুড়ের চোখ লক্ষ্য করি, বাদুড় আমাকে
দেখে কি দেখে না, ঠিক বুঝতে পারে না—

এই স্তর পর্যন্ত পৌঁছে সম্ভবত আমরাও বুঝতে পারি না এ কবিতার পরিণতি আসবে কোন্ পথে, এটুকু হয়ত শুধু বুঝতে পারি প্রথম পঙ্‌ক্তিটি শেষকালে অনিবার্যতায় ফিরে আসবে আরও একবার, কিন্তু কেন কবিতা লিখতে আর ইচ্ছে করে না এখনও পর্যন্ত যেন ততটা প্রতিষ্ঠা পায় না কবির উচ্চারণক্রম থেকে। আমাদের উৎকণ্ঠাকে টানটান রেখে কবি এগিয়ে যান কবিতাটির সমাপ্তিক মুহূর্তের দিকে, এবং অবশিষ্ট চারটি পঙ্‌ক্তির সূত্রে সহসা খুলে দেন অনুভবের নতুন এক দিগন্ত। সেই দিগন্তকে স্পর্শ করে আমরা দেখি কবির অক্ষমতা অন্য এক জায়গায় : কূলপ্লাবী স্তব্ধ নদী দুজনকে ভাসিয়ে নিয়ে তবু যে নিস্পন্দ হয়ে আছে চোখের সামনে, তার নিথর স্থিরতাকে তিনি কোন্ উপমায় অক্ষরবিন্যাসে ধরে রাখবেন, তা তিনি জানেন না। এখানেই বোধহয় তাঁর আপাতব্যর্থতা, কবিতার প্রতি বিমুখতার উৎসকারণ। কিন্তু 'আমাদের দুজনকে,' কোন্ 'দুজনকে' ? কবিতাটিতে এ যাবৎ কবি ছাড়া বাদুড়ের উল্লেখ ঘটেছে, তাহলে দ্বিতীয় এই সত্তা কি বাদুড়ের ? নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রচ্ছন্ন রাখা হল প্রেমাস্পদের উল্লেখ ?

মেনে নিতে হয় অবশ্য এই নিরুক্তির মধ্যেই তো লুকনো থাকে কবিতার প্রাপ্তি, তার চারিত্রিক ব্যঞ্জনা। 'শুধু বিচ্ছিন্নতা নয়' ছিল তাঁর তৃতীয় কবিতাগ্রন্থ, ১৯৭৬-এ, তার 'কিভাবে, কোথায়' কবিতাটিতে ছিল কি এই অনুভবেরই প্রাক্-ইঙ্গিত ?—

এখন স্তব্ধ হ'য়ে থেমে গেছে। যদি না কখনো
সরল জলের মতো জেগে ওঠে আরব্ধ হৃদয়
তাহলে কেমন ক'রে খেলা হবে ? কিভাবে, কোথায়
এক মানুষের সঙ্গে আরেক মানুষ যাবে পথের ওপরে ?

'আমার দুঃখ বোঝে বাদুড়েরা ?'—সরল ভাষার এই উচ্চারণ ভেতর পর্যন্ত নাড়িয়ে দেয় আমাদের। ভীষণ একা লাগে, কবির সঙ্গে আমাদেরও। আর এই একাকিত্ব নিয়ে কবির কাছে ঋণী হয়েই বলে উঠতে ইচ্ছে করে,—

একা একা কিছুদূর যাওয়া যায়।
তারপর খুব ক্লান্ত লাগে।
মনে হয়, পাশে কেউ থাকলে ভালো হতো।
.....
একা মানুষের দুঃখ
রাস্তার কুকুর শুধু বুঝতে পেরে, শব্দ ক'রে ওঠে। (একা)

পাঠক, আরও একবার ফিরে তাকান নির্বাচিত ওই পাঁচটি কবিতার দিকে, তাকিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করুন 'কবিতা লিখতে আর ইচ্ছে করে না' একথা বলার পরেও একজন কবি কতটা নিরুপায় সমর্পিত ভঙ্গি নিয়ে আবার কথা বলে উঠতে চান সেই কবিতার আশ্রয়েই। আসলে প্রণবেন্দুর মত সংবেদী কবির এই বিশ্বাসটায় অসম্ভব এক সততা জড়িয়ে আছে যে 'কবি মানেই হোলটাইম পোয়েট', 'ভেতরে ভেতরে প্রায় গোপনে, অন্তঃশীল ফল্গুর মতো তাঁর কবিতাচর্চার স্রোত প্রবাহিত হয় সর্বদা, তাঁর স্বরচিত মগ্নতায় তিনি প্রতি মুহূর্তে আচ্ছন্ন আপ্লুত হয়ে থাকেন। তাই আমার মনে হয়, একজন কবি যখন নিচু হয়ে জুতোর ফিতে বাঁধেন, তখনও তিনি কবি' (কবিতা ও আমি / 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮৭)।

'ডেঁয়ো পিঁপড়ে চ'লে যাচ্ছে গাছের বাকল থেকে' কিংবা 'মাঝ-রাতে বাসা বদল করে দুটো ঝিঁঝি পোকা', অথবা 'দু'একটা ইঁদুর শুধু নিঃশব্দে তাকিয়ে চ'লে যায়। / মাঝরাত্রে, মেল ট্রেন চ'লে গেলে, ব্রীজের ওপরে শব্দ হয় / গাছ থেকে, ঘুরে ঘুরে দু'একটা পাতা খসে পড়ে।'—নিভৃতি থেকে, নিসর্গ থেকে,

ধ্বনিহীন নিস্তব্ধতা থেকে এমন সব সংবেদপ্রবণ ছবিকে কবিতায় সমর্পণ করতে গিয়ে যথাযথ একটা ভাষার দরকার হয়েছিল প্রণবেন্দুর, এবং সে ভাষার ওপর সম্পূর্ণ দখল নিয়ে আগাগোড়া কথা বলে উঠতে চেয়েছিলেন তিনি। আমরা যারা তাঁর কবিতার দীর্ঘদিনের নিবিষ্ট পাঠক, তারা লক্ষ করতে ভুল করিনি যে এই ভাষার আদল কী সহজ, হৃদয়দ্রাবী, কী অজটিল তাঁর প্রকাশভঙ্গিমা। সরল কথার পথ ধরে গভীরতা, আরও নিবিড় গভীরতাকে ছুঁয়ে যাওয়া আদৌ সহজ নয়, বরং এই সরলতা যে আপাতসরলতা কিংবা প্রতারক সরলতারই নামান্তর, এ সত্য আমরা জেনেছি তাঁর নিজের কথা থেকেই ; জেনেছি এই 'সরলতা প্রাপ্ত-বয়স্কের সরলতা, শিশুর নয়।' জীবনের জটিলতা সম্পর্কে তিনি যে অনবহিত কিংবা ভাষার জটিলতা বিষয়ে তিনি যে নিতান্তই নিশ্চেতন, তা নয়, কিন্তু এই জটিলতাকে পরিশোধন করে তার থেকে সেই নির্যাসটুকুই তিনি ছেঁকে নিতে চান যা তাঁর অনুভূতির সমানুপাতিক। ওপরের পাঁচটি কবিতাই আমার এ বক্তব্যকে সর্বাংশে অনুমোদন করবে, প্রত্যাশা রাখি। জটিলতাকে তিনি অগ্রাহ্য করেননি, বরং জটিলতার মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে যেতেই তিনি একটা সময়ে তাকে অতিক্রম করে খুঁজে নিতে চেয়েছেন আপন প্রকাশরীতি, নিজস্ব মাতৃভাষা। এই বিশ্বাসটাই তাঁর ভীষণ জোরের একটা জায়গা, আর এই অনড় প্রত্যয় থেকে, গদ্যে যেমন, কবিতার উচ্চারণেও তেমনি, তিনি মুদ্রিত রাখতে চান তাঁর জীবনের আর্তি, কবিতার অন্বিষ্ট,

কঠিন বিষয় আমি কখনো মানিনি।
এই অপরাধ হোক জ্যোৎস্নার ভেতরে জানাজানি (স্বীকারোক্তি)

ওলটপালট ক'রে কথা বলতে ভয় পাই।
এইভাবে কেউ কেউ কথা বলে।
এইভাবে কেউ কেউ বিখ্যাতও হয়ে যায়, দেখি।
আমি নাজেহাল সুতো মুঠোর ভেতর লুফে নিয়ে
কারুকাজ শুরু করি একা একা,
অন্তত একটা নক্‌শা টাঙিয়ে রাখতে হবে
আমার জীবনে। (ওলটপালট নয়)

প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের দুটি কবিতা

আকাশ কোথায়

হে বড়ো বিষয় শোনো, মার্ক্স, বুদ্ধ, মারীগুটিকার মতো মোহ—
কাশ্মীর বা কন্যাকা দেশ, হেষার শব্দ শুনি ইতিহাস প'ড়ে,
তোমরা রয়েছো প'ড়ে পুরোটা দেশেরই মতো, থাকলেই বোঝা যায়, আছে—
আজ যে লুকিয়ে আছি আমরা ক'জন ছোটো পাতার ওপরে।

ফুলে-ওঠা শিরার মতন— তা কেউ কেউ দেখতে পায়, দ্যাখে
তার বেশি কিছু হ'লে, বীজময় ফল, কিংবা এরকম কিছু,
নির্ঘাৎ আঁকসি দিয়ে পেড়ে নিতো, আর যদি গম্‌গম্‌ গানে
চমকে দিতাম এই অবিনশ্বর দেশে অবিনশ্বর কথা ব'লে।

তাহলে কি ছোটো, প্রায় হলদে-বাদামী শিরাটিকে আর চেনা যেত
হয়তো বা গুপ্তযুগ, চণ্ডাশোক করতাম শুধু কথা ব'লে ব'লে
মহৎ বিষয়, ভাব, হে সুরলহরী, তুলে রাখো,—
উপুড় হয়েছে দেশ দেশেরই ওপর, এখন কোথায়, জানতে হবে,
আকাশ কোথায় ?

মানুষ ইঁদুর

ইঁদুর ধরেছে দূর কোনো জাঁতাকল। ধরুক ইঁদুর, দূরে,
এ-নিয়ে কবিতা লিখবো কখনও ভাবিনি, তবু লিখি,
পেতে রেখেছিলো কারা কারাবরণের কিছু পরে—
ইঁদুর ধরার কল ? বিকল বিকেলে, পরে অবসাদ বাড়ে
অনেক অনেক সেই সাহেবসুবোর কাল থেকে
যে-কল রেখেছো, তাতে শুধুই ইঁদুর। মানুষেরা
স্রেফ্ ব্রাহ্মণের মতো শীত উপবীত প'রে
ঘোরে, কাজ করে। ঠান্ডা লাগে, গরম লাগতো, তাই
ইঁদুরেরা মারা গিয়েছিলো, করণিক বউ কিছু সম্পাদনা করে
তোমরা গোমস্তেরা, নায়েবেরা, ঘুষখোর অঘোরবাবুর দল
তোমাদের বলি—দূর ! ইঁদুর দু'একটা গেছে, যাক, গেছে নাকি !
এখন তো বাকি আছে, ঢের আছে বাকি।

মরিস কারেমের কবিতা

ভূমিকা ও ভাষান্তর ঃ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

মরিস কারেমের কবিতার সঙ্গে এই লেখকের পরিচয় খুবই আকস্মিক। তাও সেই পরিচয় দীর্ঘ দিনের নয়। মাত্রই কয়েক বছর আগে, ১৯৮৫ সালের অক্টোবরে তার সূচনা। ফ্রান্সে ভারত-উৎসবের অঙ্গ হিসেবে আয়োজিত কবি-সম্মেলনে যোগদানের জন্য আহূত হয়ে দিন কয়েকের জন্য সেবারে প্যারিসে যাই। সম্মেলনের শেষে, সাংবাদিক হিসেবে কাজের সূত্রে, যেতে হয় ব্রাসেলসে। সেখানে শ্রীমতী জানিন বুনির সঙ্গে পরিচয় হয়। মরিস কারেমের নামে প্রতিষ্ঠিত ফাউণ্ডেশনের তিনি প্রেসিডেন্ট। তাঁরই কাছে প্রয়াত কবির জীবন ও রচনার কথা শুনি। আর শুনি তাঁর রবীন্দ্রানুরাগের কথা। কথাপ্রসঙ্গে জানতে পারি যে, শুধুই কবিতা নয়, রবীন্দ্রনাথের অন্যবিধ রচনা সম্পর্কেও মরিস কারেমের আগ্রহের অন্ত ছিল না। প্রাচ্যদেশীয় কবি তাঁর যে গ্রন্থখানির জন্য নোবেল পুরস্কার পান, আরও অনেকের মতো মরিস কারেমকেও সেই 'গীতাঞ্জলি'ই যে রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে কৌতূহলী করে তুলেছিল তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই কৌতূহল ক্রমশ 'গীতাঞ্জলি'র সীমানা অতিক্রম করে যায়, এবং স্বাভাবিকভাবেই কারেমকে টানতে থাকে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ও জীবনভাবনার দিকে।

মরিস কারেমের কবিতা যে তাঁর নিজস্ব ভাবনার উপরেই দাঁড়িয়ে আছে, এবং তারই থেকে সংগ্রহ করছে তার প্রাণরস, এ-কথা অবশ্যই স্বীকার্য, কিন্তু সেই ভাবনার মধ্যে যে রবীন্দ্রনাথের মুখচ্ছবিও মাঝে-মাঝে ফুটে ওঠে, তাও অস্বীকার করা চলে না। সাযুজ্যটা আরও বেশি করে আমাদের নাড়া দেয়, যখন আমরা কারেমের শিশু-বিষয়ক কিছু কবিতা পড়ি। সে-কথা পরে আসবে। তার আগে যা কবুল করা দরকার, তা এই যে, কবি হিসেবে যাঁর প্রতিভা ও প্রাতিস্বিকতা সম্পর্কে কোনও সংশয়ই আমার নেই, এবং তা নেই বলেই যাঁর কবিকৃতির আলোচনায় ও কবিতার অনুবাদে গত কয়েক বছর ধরেই আমি নিরতিশয় আগ্রহ বোধ করেছি, সেই মরিস কারেম সম্পর্কে আমার আকর্ষণের এটাই ছিল প্রাথমিক কারণ। রবীন্দ্রনাথের প্রতি কারেমের শ্রদ্ধা ও আগ্রহ যে ছিল আত্যন্তিক, আর-কিছু নয়, শুধু এই খবরটুকুই কারেম সম্পর্কে এই লেখককে আগ্রহী করে তুলেছিল।

বেলজিয়ামের ব্রাবঁ এলাকার ওয়াভ্র-এ, ১৮৯৯ সালের ১২ মে, মরিস কারেমের জন্ম। পাহাড়ি এলাকা ; যে-রাস্তায় বাড়ি, ছোট্ট একটা ঝর্নাও আছে সেখানে। তার থেকেই রাস্তার নাম রু দ ফঁতেন। মরিস কারেমের কবিতায় এই

রাস্তার কথা মাঝে-মাঝেই এসেছে।

১৯৭২ সালে প্যারিসে তিনি 'প্রিন্স ইন পোয়েট্রি' আখ্যায় ভূষিত হন। তাঁর আগে এইভাবে সম্মানিত হয়েছেন আর মাত্র চারজন কবি ঃ পল ফর্, জুলে সুপেরভিয়েল, জাঁ ককতো আর স্যাঁ-জন পের্স। ১৯৭৬ সালে পান 'প্রি ইউরোপিও'। ১৯৭৮ সালের ১৩ জানুয়ারি তাঁর জীবনাবসান।

২

এমন অনেক কবি আছেন, পাঠকের পক্ষে যাঁদের রচনার মধ্যে প্রবেশ করা—এমনকি পাঠক যখন সদ্যই পরিচিত হতে চলেছেন তাঁদের কবিকৃতির সঙ্গে, তখনও—খুব কঠিন হয় না। অর্থাৎ তাঁদের রচনাকে এমন একটা ভয়োদ্দীপক অট্টালিকা বলে মনে হয় না পাঠকের, যার দরজায় লটকানো রয়েছে 'প্রবেশ নিষেধ'-এর নোটিস, এবং জানলাগুলিকেও একেবারে পেরেক ঠুকে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। বরং সেখানে তাঁরা দেখতে পান এক উষ্ণ অভ্যর্থনার ইঙ্গিত। কারেম বস্তুত সেই গোত্রেরই কবি। কবিতার জানলা-দরজাকে তিনি হাট করে খুলে রাখতে ভালবাসেন। তাঁর কবিতার সঙ্গে যখন প্রথম পরিচিত হই, তখন অন্তত এমন কথাই আমার মনে হয়েছিল। দেখে ভাল লেগেছিল যে, কবিতার মধ্যে আলো-হাওয়া ঢুকবার পথগুলিকে তিনি বন্ধ করে রাখেননি।

প্রথম যে বইটি পড়ি তাঁর, সেটি আসলে মরিস কারেমের 'ম্যার' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুচ্ছের জো লানটেলমি বেল্থ-কৃত ইংরেজি অনুবাদ। তখনই লক্ষ করি যে তাঁর কাব্যভাবনা জটিল নয়, শব্দবন্ধ সাবলীল, বর্ণনা মিতবাক্ এবং উপমাগুলিও এমনভাবে নির্বাচিত, যাতে স্বতই মনে হয় যে, কোনও কষ্টকল্পনা এই কবির কাছে বিশেষ প্রশ্রয় পায় না। পরে, ফরাসি যিনি ভাল জানেন, সেই সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়ের সাহায্য নিয়ে—পড়ি তাঁর অন্যান্য নানা বই থেকে নির্বাচিত আরও অনেক কবিতা। তখন নিঃসংশয় হই যে, প্রথম পরিচয়ের সময় এই কবির সম্পর্কে যে ধারণা আমার হয়েছিল, তা ভ্রান্ত নয়। সত্যিই তাঁর কবিতায় তিনি রচনা করেন এমন এক আবহ, পাঠককে যা কাছে টানে, দূরে ঠেলে দেয় না। কারেম কখনওই উঁচু গ্রামে কথা বলেন না ; যা-ই বলুন না কেন, একটু নিচু পর্দায় বাঁধা থাকে তাঁর কণ্ঠস্বর। তা ছাড়া তিনি ব্যবহার করেন না এমন কোনও প্রতীক, আসল বস্তুটিকে আভাসিত না করে যা তাকে আমাদের নাগালের আরও বাইরে ঠেলে দেয়। কিন্তু তার চেয়েও যা স্বস্তিকর ঠেকেছিল আমার, তা এই যে, একালের পাশ্চাত্য পৃথিবীতে অনেক নামজাদা কবিরও যা প্রায় মুদ্রাদোষ হয়ে দাঁড়িয়েছে, উলটো-পালটা কথা বলে পাঠককে তাক লাগিয়ে দেবার সেই অভ্যাস

থেকে তিনি সর্বৈব মুক্ত। না, তিনি কোনও চমক লাগাতে পছন্দ করেন না; তিনি বলতে চান শুধুই সেই আনন্দের কিংবা যন্ত্রণার কথা, যা তিনি নিজের হৃদয়ে অনুভব করেছেন। কিংবা দেখাতে চান সেই স্বপ্ন, যা তিনি নিজে দেখেছেন। এবং সেই আনন্দ যন্ত্রণা কিংবা স্বপ্নের কথাও তিনি এমনভাবে বলেন, সদ্য-দীক্ষিত পাঠকের পক্ষেও যাতে সেই আনন্দ-যন্ত্রণার শরিক অথবা সেই স্বপ্নের সওয়ার হওয়া আদৌ শক্ত হয় না।

কারেমের কবিতায় সদ্য যখন প্রবেশ করি আমি, তখন অন্তত এই কথাই আমার মনে হয়েছিল। না, তাঁকে জটিল কিংবা দুরূহে ঠেকেনি আমার। বরং তাঁর উচ্চারণের মধ্যে এমন এক ধরনের সারল্যই তখন আমার চোখে পড়েছিল, কবি ও পাঠকের মধ্যে সহমর্মিতার সেতুবন্ধনে যা স্বতই সাহায্য করে।

দুরূহতারও অবশ্য আছে রকমফের। নানা কবিতায়, কিংবা নানা কবিতার নানা অংশে জীবনানন্দও দুরূহ, সুধীন্দ্রনাথও দুরূহ। কিন্তু এই দুই কবির দুরূহতার গোত্র অবশ্যই এক নয়। সুধীন্দ্রনাথের দুরূহতা প্রায়শই শব্দগত। এমন নানা শব্দ তিনি তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেন, অনেকেরই যা অপরিচিত, কিংবা বঙ্গভাষায় যার প্রয়োগ বড় একটা দেখা যায় না; উপরন্তু নানা শব্দকে তাদের প্রচলিত অর্থে যেহেতু তিনি ব্যবহার করেন না, প্রয়োগ করেন তাদের সেই মৌলিক অর্থে, যে অর্থের আশ্রয় তারা, অন্তত বঙ্গভাষায়, বহুকাল আগেই পরিত্যাগ করেছে, তাই সেটাও তাঁর দুরূহতার একটা কারণ হয়ে দেখা দেয়। তা ছাড়া, তাঁর কবিতায় মাঝে-মাঝে দেখা যায় এমন নানা বিষয়, ঘটনা কিংবা নামের উল্লেখ, যে-সব বিষয় সম্পর্কে সাধারণ পাঠকসমাজের জ্ঞান হয়তো খুবই সীমাবদ্ধ, কিংবা যে-সব ঘটনার কথা তাঁরা হয়তো জানেন না, কিংবা যে-সব নাম হয়তো তাঁরা কখনও শোনেননি। ফলে, সেইসব কবিতা যদি তাঁদের দুরূহ মনে হয়, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

অন্য দিকে একথাও স্বীকার্য যে, যে-দুরূহতা নিতান্তই শব্দগত, পরিশ্রমী পাঠকের পক্ষে তাকে অতিক্রম করা আদৌ শক্ত হয় না। একই সঙ্গে, পাঠক হিসেবেও থাকে প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা। আপন প্রস্তুতির সীমানাকে তাঁরা যদি কিছুটা বাড়িয়ে নেন, তা হলে নিশ্চয় সেই দুরূহতাকেও তাঁরা জয় করতে পারেন, তাঁদেরই অজ্ঞাত নানা ঐতিহাসিক বিষয়, ঘটনা কিংবা নামের উল্লেখের দরুন যা একটি কবিতাকে হয়তো তাঁদের উপলব্ধির বৃত্তের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখে।

জীবনানন্দের কবিতাতেও যে তেমন নানা উল্লেখ থাকে না, তা নয়। কিন্তু যা একেবারেই থাকে না, কিংবা থাকলেও থাকে যৎসামান্য, তা হল শব্দগত কঠিনতা।

কিছু-কিছু আঞ্চলিক শব্দের কথা যদি ছেড়ে দিই, তাহলে দেখা যাবে যে, আমাদের পরিচিত শব্দাবলির সাহায্যেই সাধারণত তিনি নির্মাণ করে তোলেন তাঁর কবিতা, অথচ তা সত্ত্বেও আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখতে পাই যে, শব্দ যদিও বাধার প্রাচীর তুলছে না, তবু ভাবগত দুরূহতার কারণেই তাঁর কবিতার মর্মমূলে প্রবেশ করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

কবিতা যে দুরূহ হয়, তার কারণ, বলা বাহুল্য, বিভিন্ন কবির ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম। সেইসব কারণের মধ্যে অন্তত আর একটির, প্রতীকী জটিলতার, উল্লেখ এখানে করাই দরকার; কেননা, এরই দরুন পাশ্চাত্যের অনেক কবির রচনাবলির উপরে সেই মুখোশ ইদানীং আমরা এঁটে বসতে দেখছি, কবিতার প্রকৃত মুখশ্রীকে যা আড়ালে ঠেলে দেয়, এবং পাঠককে কিছুতেই বুঝতে দেয় না তার কথা।

পাঠক যখন মরিস কারেমের কবিতা প্রথম পড়বেন, তখন এই তিন ধরনের দুরূহতার কোনওটিই যে তাঁর উপলব্ধির অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে, এমন মনে হয় না। কোন্ কবিতার ভিতর দিয়ে কী বলতে চাইছেন এই কবি, কিংবা আঁকতে চাইছেন কোন্ আনন্দ বেদনা অথবা বিষাদের চিত্র, কিংবা দিতে চাইছেন তাঁর কোন্ উপলব্ধি অথবা অনুভূতির আভাস, পাঠক সেটা ঠিকই আন্দাজ করতে পারবেন; এবং পথটা মসৃণ হলে হাঁটা যেমন একইসঙ্গে সহজ ও আনন্দদায়ক হয়, এখানেও তেমনি—কারেম যেহেতু তাঁর কবিতার কোথাও দুরূহ শব্দ অথবা কষ্টকল্পনার কাঁটা ছড়িয়ে রাখেননি—খুবই সহজ, আনন্দদায়ক ও সাবলীল হবে পাঠকের পদচারণা। স্বতই তাঁর মনে হবে যে, এমন একজন কবিকে তাঁর সঙ্গী হিসেবে পেয়েছেন তিনি, যাঁর সঙ্গ আদৌ অস্বস্তি জাগায় না; বরং যাঁর সান্নিধ্য খুবই স্নিগ্ধ ও শ্রুতিসুখায়ক। বস্তুত, তাঁর এমনও মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, মরিস কারেমের কবিতার ভিতর থেকে যে অর্থ তিনি নিষ্কাশন করে নিয়েছেন, তারই ফলে যেন আমাদের চারপাশের জগৎ ও জীবন এক অন্যবিধ তাৎপর্য নিয়ে ধরা দিচ্ছে তাঁর চোখে। কারেমের কবিতা প্রথম পাঠের সময়ে এই যে অর্থ তিনি পেয়ে যাচ্ছেন, এটাই তাঁকে খুশি করবার পক্ষে যথেষ্ট, তাতেও সন্দেহ নেই। (কবিতার শব্দ নির্বাচনে কারেম ছিলেন সহজ পথের পথিক। শ্রীমতী জানিন বুনি তাঁর এক প্রবন্ধে—বাংলায় যার অর্থ দাঁড়ায় 'মরিস কারেমের শব্দ-স্বাদ'—এই সহজ পন্থার তাৎপর্য, শব্দ-বিষয়ে কারেমের মতামত-সহ, অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।)

কিন্তু সেই একই পাঠক যখন দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার কি চতুর্থবার পাঠ করবেন এই কবিকে, তখন—অনেক কবিতার ক্ষেত্রেই, এবং প্রায় অনিবার্যভাবেই—একটা প্রশ্ন হয়তো উঁকি দেবে তাঁর চিত্তে। প্রশ্নটা আর কিছুই নয়, প্রথম পাঠের সময়

কারেমের যে কবিতার যে-অর্থ তিনি ধরেছিলেন, সেটাই কি তার একমাত্র অর্থ, নাকি ইংরেজিতে যাকে 'ইমিডিয়েট মিনিং' বলা হয়, সেই তাৎক্ষণিক অর্থের অতিরিক্ত অন্য কোনও অর্থ রয়েছে সেই কবিতার ? বলা বাহুল্য, দীর্ঘায়ু কোনও কবিতারই কাজ ফুরোয় না অনধিক একটিমাত্র অর্থের জানান দিয়ে। (অন্যভাবে বলা যায়, একটিমাত্র অর্থই যার সম্বল, প্রায়শই সেই কবিতাকে আমরা দীর্ঘায়ু হতে দেখি না।) যতই সেই কবিতা পড়ি আমরা, ততই আমাদের মনে হতে থাকে যে, দৃশ্যত যতই সরল ঠেকুক, তার মধ্যে যেন লুকিয়ে রয়েছে দ্বিতীয় কোনও অর্থ। এমন কোনও অর্থ, ওই আপাতসারল্য যার নির্মোক মাত্র, এবং চট করে যা ধরা দিতে চায় না। প্রসঙ্গত বলি, রবীন্দ্রনাথেরও অনেক কবিতাই আসলে এই ধরনের 'সরল' কবিতা, যা প্রথম পাঠের সময়ে—তাদের তাৎক্ষণিক অর্থের কারণে—যতই সহজ ঠেকুক, ক্রমশ আমাদের মনের মধ্যে অসংখ্য রকমের জিজ্ঞাসা জাগিয়ে দেয়, এবং পরবর্তী প্রতিটি পাঠের সময়ে আমাদের দিয়ে মনে করিয়ে ছাড়ে যে, সেইসব কবিতার মধ্যে—পরতে-পরতে—এমন আরও নানা অর্থ হয়তো গোপন থেকে গেল, ভবিষ্যৎ-কালের পাঠকরা হয়তো—তাঁদের সময় ও পরিবেশের সঙ্গে অন্বিত করে—যা আবিষ্কার করতে পারবেন, এবং যার তাৎপর্য হয়তো তাৎক্ষণিক অর্থের চেয়ে অনেক বেশি।

যেমন রবীন্দ্রনাথের, তেমনি কারেমের আগ্রহও কোনও বিশেষ বিষয়ের নির্দিষ্ট পরিসরে আবদ্ধ ছিল না। তবে (রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলের ব্যাপারটা যেখানে পুনশ্চ মনে পড়বে আমাদের) বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে প্রেম ও প্রকৃতিই যে কবি হিসেবে তাঁর আগ্রহের একটা মস্ত অংশের দখল নিয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। একই সঙ্গে আমরা লক্ষ করি যে,একটি শিশুর মুখচ্ছবিও তাঁর ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে অকস্মাৎ উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠত। এমন একটি শিশু, যাকে কখনও-কখনও কোনও দৈব মহিমার সঙ্গে অন্বিত করে দেখেছেন তিনি, আবার কখনও-কখনও যে কিনা গোটা মানবসমাজের প্রতিভূ হিসেবে আমাদের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে যায়। নীচের পঙ্‌ক্তিগুলি লক্ষ করুন :

'পায়রাটি শ্বেতবর্ণ।
শিশুটিও তা-ই, সাদা ফ্লানেলের কম্বলে ঢাকা তার শরীর।
আপন মনে তারা কী বলল, তারা কী এমন বলতে পারে,
যা শুনবার জন্যে
বাগানে তার যে জামাকাপড় শুকোচ্ছে, তার
আড়াল থেকে দেবদূতেরা
একবারও তাদের পাখার বাতাস বন্ধ করতে পারেনি ?'

এই পঙ্‌ক্তিগুলি যখন আমরা পড়ি, 'শিশু ও কবুতর' কবিতার 'সাদা ফ্লানেলের কম্বলে ঢাকা' শিশুটি তখন যেন আর সাধারণ একটি মানবশিশু হিসেবে প্রতিভাত হয় না আমাদের চোখে, পরন্তু তার মাথায় যেন আমরা বেথেলহেমের দৈবশিশুর জ্যোতির্ময় বলয়টিকেই প্রত্যক্ষ করতে থাকি।

কিংবা ভাবা যাক 'শিশু-১' কবিতাটির কথা। এক মুঠো সাদা বালি নিয়ে আপন মনে খেলছে যে শিশুটি, তার ছবি আঁকতে বসে কারেম যখন বলে বসেন :
'যখনই সে বন্ধ করবে চক্ষু দুটি তার
মস্ত একটা রাজবাড়িতে গিয়ে ফের ঢুকবে সে তখনই'

তখন রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' গ্রন্থের 'রাজার বাড়ি' কবিতার সেই শিশুটির কথাই আমাদের মনে পড়ে, যে খুব সহজেই বলতে পেরেছিল :
'আমার রাজার বাড়ি কোথায় কেউ জানে না সে তো !
সে বাড়ি কি থাকত যদি লোকে জানতে পেত।'

তফাত এইটুকুই যে, কারেমের কবিতায় কবি যেখানে শিশুর চোখে রাজবাড়ির স্বপ্ন আঁকছেন, কিংবা বলা যায় শিশু-কল্পনার অঙ্গ হিসেবে ভাবছেন রাজবাড়ির কথা, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সেখানে শিশুর মুখ দিয়েই সেই রাজবাড়ির কথা বলিয়ে নেওয়া হচ্ছে। দুই কবির ভাবনার যে সাযুজ্য, এই পার্থক্য সত্ত্বেও কিন্তু সেটা আমাদের চোখ এড়িয়ে যায় না।

আসলে কারেম যখন কোনও শিশুকে এনে বসান তাঁর কবিতার মধ্যে, কিংবা সেখানে জায়গা করে দেন কোনও শৈশবকালীন অনুষঙ্গের, তখন ইতস্তত রবীন্দ্রনাথের কথা আমাদের মনে পড়ে বলেই তাঁর 'বিদ্যাভবন' কবিতার তর্জমায় রবীন্দ্রনাথের একটি অতি-পরিচিত বাক্যাংশকে ব্যবহার করতে আমি কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিনি। এই কবিতায় যেখানে 'বরু দু মঁদ' বা পৃথিবীর তটপ্রান্তের কথা বলছেন কারেম, সেখানে উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে সরাসরি বসিয়ে দিয়েছি 'জগৎ-পারাবারের তীরে'।

তাঁর কবিতায় শিশুর আলেখ্যকে যেমন নানাভাবে এঁকেছেন এই কবি, তেমনি নানা ভাবে, নানা দৃষ্টিকোণ থেকে, তিনি দেখেছেন মানব-মানবীর সম্পর্ক। যেমন সংরক্ত প্রণয়ের, তেমনি এঁকেছেন দুর্বহ বিচ্ছেদের চিত্রমালা। কখনও ধরতে চেয়েছেন সেই নারীকে, যে শুধু স্বপ্নেই তাঁকে দেখা দেয় ; কখনও রচনা করেছেন তার কল্পিত মুখশ্রী, কিংবা সেই নারীর মুখের আবছা কোনও আদল। কারেমের কবিতায় বাস্তবের নারী যে কখনও আসেনি তা নয়, প্রায়ই এসেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে অনেক সময়েই আমার মনে হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথের

'উর্বশী'র মতো, তাঁরও চিত্তে জাগরূক ছিল অক্ষয় অনন্ত যৌবনের প্রতীক এক নারীর প্রতিমূর্তি, যে-নারী শুধু আমাদের ভাবনাতেই মাঝে-মাঝে উঁকি দিয়ে যায়, বাস্তবে কখনও ধরা দেয় না। আবার, একদিকে যেমন তাঁর আকাঙ্ক্ষার আঁচ পাই তাঁর কবিতায়, সেখানে শুনতে পাই অগ্নিজ্বালায় জর্জর একটি মানুষের ব্যাকুল আর্তি, তেমনি অন্যদিকে তাঁর কবিতার ভিতর থেকেই মাঝে-মাঝে ভেসে ওঠে সেই নিরাসক্ত মানুষের মুখ, আকাঙ্ক্ষার আগুন যাকে পোড়াতে চেয়েছিল বটে কিন্তু পোড়াতে পারেনি। স্নিগ্ধ একফালি হাসিও সেই মানুষটির মুখে দেখতে পাই আমরা; মনে হয়, নির্মল কোনও কৌতুকের স্মৃতিই যেন সেই মুখের উপরে খেলে বেড়াচ্ছে।

কারেম যে প্রকৃতিকে একটু বেশি মাত্রাতেই ভালবাসতেন, এটা বুঝবার জন্য সন্ধানী একজোড়া চোখের দরকার হয় না; কেননা তাঁর কবিতার প্রায় আদ্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে সেই ভালবাসার নিদর্শন। বেলজিয়ামের নিসর্গ-প্রকৃতির দর্পণ তাঁর কবিতাবলি। তার আকাশ, নদী, পাহাড়, কুয়াশা, তুষার, বন—সমস্ত কিছুই প্রতিবিম্বিত হয়েছে সেখানে। কিন্তু শুধু দর্পণই বা বলব কেন? প্রশ্নটা এইজন্য তুলছি যে, দর্পণ তো কোনও শব্দ আমাদের শোনায় না, প্রতিচ্ছবিটাই দেখিয়ে দেয় মাত্র, অথচ কারেমের কবিতা যখন পড়ি আমরা, তখন সেখানে গাছ-পালার ভিতর দিয়ে ঝোড়ো বাতাসের বয়ে যাওয়ার শব্দটাও যেন মাঝে-মাঝে আমরা শুনতে পাই, এমনকি নদীর কলধ্বনিও আমাদের কানে এসে বাজে।

নিসর্গ-প্রকৃতির প্রতি এই কবির অনুরাগের সত্যিই অন্ত ছিল না। কারেমের কবিতা নিয়ে কাজ করবার জন্য বেলজিয়ামে এসে এই যে কয়েকটা মাস এখানে কাটিয়ে যেতে হল, এরই মধ্যে নানান জনের মুখে শুনেছি সেই অনুরাগের কথা। শুনেছি, ছুটি পেলেই তিনি ব্রাসেল্‌স্ ছেড়ে বাইরে চলে যেতেন। এমন সমস্ত জায়গায় যেতেন, যেখানে মানুষের হাত এখনও অরণ্যপ্রকৃতির স্বাভাবিক রূপের কোনও বিকার ঘটাতে পারেনি। এমন ঘটনাও প্রায়শ ঘটেছে যে, অরণ্যের মধ্যে বসেই তিনি কবিতা লিখে গিয়েছেন অবিশ্রান্ত। শ্রীমতী বুনি (মরিস কারেমের আন্তরিক সান্নিধ্য যিনি ছত্রিশ বছর ধরে পেয়েছেন) আমাকে তেমন কয়েকটি জায়গায় নিয়েও গিয়েছিলেন। একটি জায়গা অর্‌ভাল, যেখানে একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত একটি গির্জার ধ্বস্ত অবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। চারদিকে অরণ্য আর পাহাড়ের বলয়, আর তারই মধ্য দিয়ে বয়ে গিয়েছে সেমোয়া নদী। সেই নদীর সান্নিধ্যে, অর্‌ভালের শান্ত পরিবেশে, দিনের পর দিন কাটিয়েছেন মরিস কারেম। শুনেছি, একবার সেখানে গেলে তিনি আর সহজে ফিরে আসতে চাইতেন না।

অর্‌ভালের ধ্বস্ত গির্জার পাশেই (সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে) গড়ে ওঠে যে নতুন গির্জা ও মঠ, তার সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের গ্রন্থাগারে শুনেছি, রবীন্দ্ররচিত প্রচুর গ্রন্থ রয়েছে। অর্‌ভালের প্রতি মরিস কারেমের আকর্ষণের সেটা দ্বিতীয় কারণ। শুনেছি, সেই গ্রন্থাগার থেকে রবীন্দ্রনাথের বই আনিয়ে নিতেন তিনি, এবং যখন ব্যাপৃত থাকতেন না নিজের রচনার কাজে, তখন প্রধানত রবীন্দ্ররচনা পড়েই তিনি সময় কাটাতেন। পড়তে-পড়তে মাঝে-মাঝে নাকি বলেও উঠতেন, "আরে, এতো আমারই কথা। আমিও তো এই কথা ঠিক এমনি করেই বলতে চেয়েছিলুম।" তা ছাড়া পড়তেন উপনিষদ; সম্ভবত রবীন্দ্রনাথকে আরও ভালো করে বুঝবার জন্যই।

প্রকৃতির প্রতি তাঁর আকর্ষণের প্রসঙ্গে ফিরে যাই। সর্বদাই যে তিনি মানুষের সংসার থেকে একেবারে আলাদা করে নিয়ে প্রকৃতিকে দেখতে চাইতেন এবং আঁকতে চাইতেন তাঁর ছবি, তা কিন্তু নয়। এটা ঠিক যে, তাঁর কিছু কবিতায় প্রকৃতি একেবারে বিচ্ছিন্নভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু, এরই অন্য দিকে, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে অবিরত যে ভাঙাগড়ার খেলা চলছে, তাও তাঁর ভাবনায় কিছু কম তরঙ্গ তোলেনি। আবার তারই পাশাপাশি, মনুষ্যেতর প্রাণী-জগৎ-সহ নিসর্গপ্রকৃতিকে যেভাবে তিনি চিত্রিত করেছেন তাঁর কবিতায়, তাতে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, এ নেহাত দূরে দাঁড়িয়ে চিত্র রচনা করবার ব্যাপার নয়, তিনি নিজেও সেখানে ঝাঁপ দিয়েছেন সেই চিত্রের মধ্যে, এবং প্রকৃতির সঙ্গে নিজের সত্তাকে একেবারে অবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত করে নিয়েছেন। তা নইলে নিশ্চয় 'ইকারাসের মতো' কবিতায় এমন আশ্চর্য ক'টি পঙ্‌ক্তি রচনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না:

'....ভাই যেভাবে ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে
ঠিক সেইভাবেই আমি তখন
ম্যাগপাই আর সোয়ালো পাখিদের সঙ্গে কথা বলতুম।'

'ইকারাসের মতো' অবশ্যই প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতা নয়, কিন্তু এই পঙ্‌ক্তি কটিই জানিয়ে দিচ্ছে যে, নিসর্গপ্রকৃতির সঙ্গে পশু পাখিদের যে আত্মীয়তার সম্পর্ক, সেই সম্পর্কই গড়ে নিতে চাইছেন তিনি, ঢুকে পড়তে চাইছেন প্রকৃতির একেবারে অন্দরমহলের মধ্যে।

শব্দ দিয়ে বর্ণাঢ্য চিত্র-রচনার হাতও বড় নিপুণ ছিল মরিস কারেমের। কত নিপুণ, 'সমুদ্রে রজনী' কবিতাই তা আমাদের বুঝিয়ে দেয়। সূর্যাস্তের পিছনে-পিছনে যখন রাত্রি নামছে, তখন সেই রাত্রিকে এক কালো ঘোড়ার সঙ্গে তুলনা করছেন তিনি। তাঁর মনে হচ্ছে, ঘোড়াটি যেন সমুদ্রের ধার দিয়ে দৌড়চ্ছে,

আর তার পিছনে-পিছনে সমুদ্রবক্ষ থেকে উঠে আসছে সেই বিশাল কালো জাল, যার মধ্যে—উজ্জ্বল রত্নসম্ভারের মতোই—অস্তসূর্যের রক্তাভ আলোর চূর্ণগুলি ছড়িয়ে পড়ে আছে। বিদেশি কবিতার নিয়মিত পাঠক আমি নই। তবু বলি, পাশ্চাত্যের কবিতায় এমন আশ্চর্য সুন্দর চিত্রকল্পের দেখা আমি দীর্ঘকাল পাইনি।

মরিস কারেম সম্পর্কে অন্য যে একটি জরুরি কথা এখানে বলা দরকার, তা এই যে, মানুষকে তিনি প্রবলভাবে ভালবাসতেন। সেই ভালবাসাই বিদীর্ণ হয়ে আছে তাঁর কবিতায়, যা সন্দেহাতীতভাবে আমাদের জানিয়ে দেয় যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ কিংবা এই রকমের অন্য কোনও সংকীর্ণ পরিচয় নয়, মনুষ্য পরিচয়কেই তিনি সর্ব মানবের চূড়ান্ত পরিচয় বলে গণ্য করতেন। তাঁর কবিতা যখন প্রথম পড়ি, নীচের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি তখনই তাঁর প্রতি আমার আগ্রহকে যৎপরোনাস্তি আকর্ষণ করেছিল :

'....মানুষকে, হ্যাঁ, তাবৎ মানুষকে....আমি ভালবাসি।....
প্রত্যেকেই আদল-মাফিক ওই ফুটে উঠছে ওরা।
ঈশ্বরের আদলে ফুটছে,
সাদা, কালো, হলুদ অথবা অগ্নির মতো বর্ণ নিয়ে....'

যদি বলি যে, 'আমি ভালবাসি' কবিতার এই পঙ্‌ক্তিগুলোর মধ্যে যে-সুর আমরা বেজে উঠতে শুনি, কারেমের কবিতার সেটাই স্থায়ী সুর, তাহলে ভুল বলা হবে না। বস্তুত, যেখানে ব্যক্তি-মানুষ বা বিশেষ-মানুষের কথা বলেন তিনি তাঁর কবিতায়, সেখানেও মাঝে-মাঝে এক নির্বিশেষ মানুষের মুখচ্ছবি আমরা দেখতে পাই। সেই মুখচ্ছবিই যেন আরও অপ্রতিরোধ্যভাবে তাঁর কবিতার প্রতি আকর্ষণ করে আমাদের, তাঁর ভাবনার সঙ্গী হবার জন্য আমাদের ডাক দেয়। ভাষা, বর্ণ, সংস্কার ইত্যাদি তখন আর কবি ও তাঁর পাঠকের মধ্যে কোনও বাধার প্রাচীর তোলে না।

পরিশেষে একটা কথা বলি। আমি ফরাসি জানি না। তাই তর্জমার ব্যাপারে আমাকে শ্রীসুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়ের ইংরেজী অনুবাদের উপরে অনেকাংশে নির্ভর করতে হয়েছে। 'অনেকাংশে' এই কারণে বলছি যে, শ্রীমতী জানিন বুনিও এ-ব্যাপারে আমাকে প্রভূত সাহায্য করেন।

ইকারাসের মতো

বিশ্বাস করো, মাঝে-মাঝেই আমার ডানা গজিয়ে যেত।
বাতাসে আমার বিশাল জামা
ফুলিয়ে নিয়ে যাতে সোয়ালো পাখিদের সঙ্গে
খুব সহজেই আমি আবার মিশে যেতে পারি।

মধ্য-গগনে সূর্যদেব আমার দিকে তাকিয়ে থাকতেন। আর
ইকারাসের মতোই আমি তাঁর কাছ-বরাবর চলে যেতে চাইতুম।
তিনি বলতেন, "পারিস তো আয়।" আর আমি এগিয়ে যেতে-যেতে
হেসে উঠতুম এক দুঃসাহসী লুঠেরার মতো।

পড়ে যাবার কোনও ভয়ই আমার ছিল না।
তার কারণ, আমার মা সেই জামাটা বানিয়ে দিয়েছিলেন।
এমন জামা, যা সূর্যের তাপে গলে যায় না,
ভয়ঙ্কর রোদ্দুরেরও যাকে পুড়িয়ে দেবার সাধ্য নেই।

আবার যখন আমি মাটিতে নেমে আসি,
আমি যে একজোড়া ডানা পেয়ে গেছি, সে-বিষয়ে আমি তখন
এতই নিশ্চিন্ত যে, ভাই যেভাবে ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে,
ঠিক সেইভাবেই আমি তখন
ম্যাগপাই আর সোয়ালো পাখিদের সঙ্গে কথা বলতুম।

তখনও সে ছোট

স্বর্ণবর্ণ চুল ছিল শিশুটির,
তখনও সে ছোট, নিতান্তই সে ছোট,
সবাই দেখেছে, শিশুটির চোখ দুটি
খেলত শুধুই নীল গগনের সঙ্গে।
ধূসর মাটিতে ওইখানে তাকে কেউ
ধুলোর মধ্যে রেখে গিয়েছিল, একা।
হাসছিল সেই শিশুটি, বাতাস বইলে কিংবা পাখি
দেখলে শিশুরা যেভাবে হাসতে পারে।
যদি বা ছড়িয়ে দিচ্ছিল তার হাত,
তা সে দিচ্ছিল পায়ের আলতো আঘাতে
এ-দিকে ও-দিকে ছড়াতে-ছিটোতে কয়েকটি সাদা নুড়ি।

শিশু ও কবুতর

অন্ধকারে কান পেতে মনে হয়েছিল, চাঁদ
বাতাসের সঙ্গে কথা বলছে।
মনে হয়েছিল, ঘাস যেন ঘাস নয়, নরম পুরু গালিচা, আর
ফুলগুলি যেন রঙিন পোশাক পরে উড়ছে।
পায়রাটি শ্বেতবর্ণ।
শিশুটিও তা-ই, সাদা ফ্লানেলের কম্বলে ঢাকা তার শরীর।
আপন মনে তারা কী বলল, তারা কী এমন বলতে পারে,
যা শুনবার জন্যে
বাগানে তার যে জামাকাপড় শুকোচ্ছে, তার
আড়াল থেকে দেবদূতেরা
একবারও তাদের পাখার বাতাস বন্ধ করতে পারেনি ?

এত সরল

এত যে সরল, তবু ভুল বোঝে সবাই,
এত ধনী, তবু ভিক্ষুক হয়ে সর্বাকছু চেয়ে ফিরি।
এত যে বিনয়ী, তবু নতজানু হই না,
এত একা, তবু এত আমি ভালবাসি।

ঢালু বেয়ে ওই নীচে নামবার আকাঙ্ক্ষা জাগে মনে,
আসলে যখন ঊর্ধ্বমার্গে উঠতে চাইছি জানি ;
সাত-তাড়াতাড়ি নিজেকে আগুনে পোড়াই,
জলের উৎস আমাকে যখন দেয় তার হাতছানি।

সংহত আমি শেষাবধি জেনো করবই ঠিক নিজেকে,
দেখবামাত্র নির্ভুল যাতে আমাকে চিনতে পারো।
জমাট কঠিন বর্তুল হিমপিণ্ড যেমন সহসা
ধরা পড়ে তার ভবিতব্যের হাতে।

শিশু

সেখানে সমুদ্র ছিল অনন্ত, অপার।
ছিল তরঙ্গের নৃত্যভঙ্গ আর জাহাজের পাল।
ঊর্ধ্বে মরকতকান্তি ছিল সেই অনাদি আকাশ,
যে-আকাশে গলে গিয়েছিল শেষ নক্ষত্রের আলো।

সেখানে সমস্ত-কিছু অনন্ত অনাদি,
বালুকাও স্মৃতিহীন।
সেখানে রাত্রির নীচে যে-শিলানিচয় পড়ে আছে,
না, তাদেরও গল্প নেই কোনও।

কিন্তু এই যথেষ্ট যে, একটি শিশু রয়েছে সেইখানে।
তাই এই ব্যাপ্ত সুবিশাল দৃশ্যপট
সময়ের সুবেদী সারল্য নিয়ে
একখানি মুখের উপরে
হেসে ওঠে।

যাত্রী

লোকটা পাড়ি দিয়েছে বিস্তর পথ,
পেরিয়েছে বিস্তর সমুদ্র আর পাহাড়,
প্রণতি নিবেদন করে এসেছে অনেক সাধুসন্তকে,
দেখেছে, যা-কিছু একজন মানুষের পক্ষে দেখা সম্ভব।
লোকটা যুদ্ধ করেছে। না, কোনও কর্তব্যের তাড়নায় নয়,
স্রেফ নিজের শৌর্যের প্রমাণ দেবার জন্য।
তা হলে আর নিজেকে ছলনা করবার দরকার কী ?
অনশ্বরতা তো আর কিছুই নয়,
উদ্বেগের এক বিশাল গহ্বর,
যা কিনা ওর জন্যে তৈরি হয়নি।

নিশীথে

সে ছিল রাত্রির সঙ্গে একা।
উপরন্তু একাকী ছিল সে
নিজস্ব রাত্রির মধ্যে তার।
যে-রাত্রে ছিল না তারা আকাশে একটিও।
নক্ষত্রবিহীন সেই নিশীথ যেন-বা
গ্রামের উপরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল।
এবং সে বিস্ময়বিমূঢ়
দেখছিল সমস্ত কিছু জানালার আড়ালে দাঁড়িয়ে।

আসলে বৃহৎ কিছু দরকার করে না
নিয়তিকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য।
গোলাপের একটিমাত্র কাঁটা
আসন্ন মৃত্যুকে খুব সহজেই ছত্রভঙ্গ করে দিতে পারে।

স্বপ্ন

যে-নারীকে স্বপ্নে দেখা যায়,
যে-আবছা লাবণ্য উঠে আসে
ধীরে-ধীরে তোমার ওষ্ঠের দিকে,
তাকে ধীরে চলে যেতে দাও,
তাকেও দেখতে দাও তার স্বপ্নখানি।

এও স্বপ্নলোকের ব্যাপার।
এ সেই সরণি, যাতে ঢুকে
সবকিছু স্বপ্নীভূত হয়।
যেখানে তাকেও গিয়ে পৌঁছতে হবেই
চিন্তাভাবনা না-করে একবারও।

আমরা কি তা হলে শুধু স্বপ্ন দেখে যাব,
নিরবধি কাল?
তোমার ওষ্ঠে কি কোনোদিন
চুম্বনের মতন কাঁপবে না
সেই নারী, যে স্বপ্ন দেখতে জানে?

আমি সর্বদাই বেঁচে ছিলুম

আমি সর্বদাই বেঁচে ছিলুম,—তিনি বললেন,
সর্বদাই আমি এই ধুলোর পরে নৃত্য করেছি।
সে তো আজকের কথা নয়, হাজার হাজার বছর আগেকার ব্যাপার।
ভাঁজিলেরও আগে, হোমারেরও আগে।

এক মুহূর্তের জন্যে আমি বেরিয়ে এসেছিলুম, যাতে
পরক্ষণেই আবার দ্রুত ওখানে আমি ঢুকে যেতে পারি।
হাজার-হাজার বছর ওখানে আমি থাকব, তা সে
মানুষ, শুয়োপোকা কি ফুল, যে চেহারাতেই হোক।

আমি হতে চাইনি ওই ছুতোর,
যে কিনা
জানলার কাঠে এখন পালিশ লাগাচ্ছে।

কোনও গানই আর বাজবে না আমার গলায়,
যদি ফের পাখি হয়ে জন্ম নিই,
আমারই ভস্ম থেকে।

মুখ-পরিক্রমা

ওই মুখ, আমি ওর কী বর্ণনা দেব?
প্রিয়তমা, আমি যে তোমাকে বড় বেশি ভালবাসি।
ওই মুখ থেকে যাত্রা করেছে যে জাহাজের সারি,
আমি তারই রঙজুজালে হারাই নিজেকে।

আমার প্রণয় চেষ্টা করেছে অনেক
তোমাকে একখানি মানচিত্রের মতন পড়ে নিতে।
যাত্রাভঙ্গ একবারও করিনি
বিচিত্রসুন্দর ভূমি বার্বাডোজে পৌঁছতে কখনও।

সে তো সুখ-অন্তরীপ, সর্ববিধ সমুদ্রবায়ুতে
নাবিকবৃত্তিতে ক্রমে কেটে গেল অনেক বছর।
কিছুই কি ততখানি প্রার্থনীয় নয়,
সমুদ্রের চিত্ত একটি দ্বীপকে করে প্রার্থনা যতটা?

প্রিয়তমা, আমি যে তোমাকে বড় বেশি ভালবাসি।

গড়ে দেব সুন্দর জাহাজ

তোমাকে একটি আমি গড়ে দেব সুন্দর জাহাজ,
যাতে সব সামুদ্রিক পীড়া ও বিপদ
এড়িয়ে অক্লেশে তুমি শহরের কুৎসিত রটনা
থেকে দূরে ভেসে যেতে পারো।

বার্চের গুঁড়ির মধ্যে গড়ে দেব সুন্দর আশ্রয়,
যাতে যৎসামান্য পোশাক নিয়ে তুমি
ভেসে পড়তে পারো
তরঙ্গ ও নক্ষত্রমালার মধ্যদেশে।

আমার হৃৎপিণ্ড সেই জাহাজের মাস্তুলে বসাব।
যাতে সর্ব ঋতুতেই অনুকূল হাওয়া
পালে লাগে। যাতে
দিগন্তের মতো গোল হয়ে ফুলে ওঠে সেই জাহাজের পাল।

বাঁচা এত সহজ

সাদা মেঘ, নীল আকাশ, আর
পপলারের সারি।
আ, কে ভাবতে পেরেছিল যে, সেও
সুখী হতে পারবে!

ঈশ্বর! বাঁচা এত সহজ!
আমি দেখছি যে, সময়
গুলমের সুগন্ধবহ নদীটির মতো

আমার দুই পায়ের ভিতর দিয়ে বয়ে যায়।

দ্যাখো, আমার হৃদয় যেন
বিশাল ওই সূর্যমুখী ফুলের মতো,
যে-ফুল বাগানগুলিকে আলো করে রেখেছে।

আর ওই রাস্তাগুলি আমার হাতের মতো
পরস্পরের সঙ্গে এসে মিলিত হচ্ছে।
কাল সবই খুব সহজ হয়ে যাবে।

বিদ্যাভবন

'জগৎ-পারাবারের তীরে' যে বিদ্যাভবন ছিল,
ছিল সে-ভবন সময় সাগরবেলায়।
ভিতরে সে ছিল বুঝে বোঝাই। আর
সেই বাড়িটির বাইরে উড়ত অজস্র সাদা পায়রা।

সেখানে তারা যে গল্প শোনাত, সেগুলি
আধুনিক কথাকাহিনীর চেয়ে ঢের বেশি সুন্দর।
এদিকে আমি তো গল্পগুলিকে যেই না ভেবেছি সত্যি,
কোথায় যে আছি, তারপর থেকে সেটাই বুঝতে পারি না।

দেওয়াল আঁকড়ে জানলার পাশে উঠেছে পুষ্পলতা,
দেখা যাচ্ছে না যেন-বা কোথাও কাউকে,
প্রাঙ্গণে বার্চ-বৃক্ষেরা দোলে, দুলে-দুলে ফুলে ওঠে,
যেন দর্পণে প্রতিবিম্বিত সোনালি বৃষ্টিধারা।

নিকষ-কৃষ্ণবর্ণ তাবৎ ব্ল্যাকবোর্ডের পরে
পাল তুলে দেখি ভেসে যায় বড়-হাতের বর্ণমালা,
যেখানে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধি আমরা
নব-নব উপকূলের দিকেই চলেছি।

'জগৎ-পারাবারের তীরে' যে বিদ্যাভবন ছিল,
ছিল সে-ভবন সময়-সাগরবেলায়।
আহা আমি যদি আরবার সেই সময়ে ফিরতে পারি
তবে আরবার দেখি যে বাইরে উড়ছে শুভ্র পায়রা।

আমি ভালবাসি

আমি আমার চোখ দুটিকে ভালবাসি, আমি আমার কণ্ঠস্বর ভালবাসি,
আমি হাসিখুশি থাকতে ভালবাসি, আমি ভালবাসি আমারই মতো থাকতে

পৃথিবীর বুকের কাছ-বরাবর নিজেকে গোপন করে রাখতে,
অন্ধকারে যেমন গোপন থাকে পাখির বাসা।

রুটির তপ্ত গন্ধ আমি ভালবাসি,
ভালবাসি হাতের পাতার উপর দিয়ে নির্মল জলের বয়ে যাওয়া।

আমি নীল ভালবাসি, আমি সবুজ ভালবাসি,
হ্যাঁ হে, আমি ভালবাসি গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে !

আর মানুষকে, হ্যাঁ, তাবৎ মানুষকে, ওই যারা
আপেলের মতন গড়িয়ে যাচ্ছে, তাদেরও আমি ভালবাসি।

কেউ পরিপক্ক, কেউ নিজের সম্পর্কে আস্থাবান,
প্রত্যেকেই আদল-মাফিক ওই ফুটে উঠছে ওরা।

ঈশ্বরের আদলে ফুটছে,
সাদা, কালো, হলুদ অথবা আগুর মতো বর্ণ নিয়ে

বহু যুগের কবোষ্ণ বৃষ্টিধারার নীচে
ভালবাসা পাবার জন্যেই ফুটছে ওরা

আর এই সকালে তোমরা যারা ভালবেসেছ আমাকে, হেসে ওঠো,
যে যার হাসির মধ্যে আমার গলা-ই শুনতে পাবে।

পাখি

পাখিটাকে ধরল, তারপর সে
কেটে ফেলল তার ডানা ; আর
পাখিটা তখন আরও উঁচুতে উড়ে গেল।

আবার যখন সে পাখিটাকে ধরল, তখন
কেটে ফেলল তার পা দুটি ; আর
নৌকোর মতনই পিছলে ভেসে গেল সেই পাখি।

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে সে তখন কেটে ফেলল তার ঠোঁট। আর
পাখিটা তখন তার হৃদয় দিয়ে
বীণা যেমন সুরতরঙ্গ ছড়ায়, সেইভাবে গান গেয়ে উঠল।

সে তখন কেটে ফেলল তার গলা।
আর তখনই সেই পাখির প্রতিটি রক্তবিন্দু থেকে
বেরিয়ে এল আরও উজ্জ্বল পাখি।

সমুদ্রে রজনী

ফুটেছে গোলাপি বর্ণ নির্মেঘ আকাশে।
তার মধ্যে এই চিত্র ঃ যেন বল্গা-ছেঁড়া এক কালো ঘোড়া সমুদ্রের ধারে
দৌড়িয়ে চলেছে।
ওইখানে ডুবেছে সূর্য শব্দহীন, আর ওই ঘোড়ার পিছনে
যেন উঠে আসছে জাল সমুদ্রের থেকে,
রাত্রির যে-জালে ধরা পড়েছে সূর্যের
বিধ্বস্ত আলোর চূর্ণগুলি।

জননী-২

সন্ধের দিকে তুমি কখনও-কখনও আমাকে
এমনভাবে মৃত্যুর কথা বলতে যে, আমার মনে হত যেন
তখনই তুমি জীবন থেকে সরে গিয়েছ খানিকটা।
যেন যে-জীবনের নগ্ন পরিচারিকা ছিলে তুমি, তার থেকে
তোমার চিত্ত ইতিমধ্যেই খসে পড়েছে।

তুমি শান্ত স্বরে বলতে, বাড়িটা আমি যেন বিক্রি করে না দিই।
যেন লাল বেরির ঝোপগুলিকে
উপড়ে না ফেলি তোমার বাগান থেকে।
যেন শস্যের ভাঁড়ার লুঠ করে নেবার জন্যে শীতকালে এখানে
নেমে আসে যে হাঁসের ঝাঁক,
তাদের দিকে আমি রুটির টুকরো ছুঁড়ে দিই।
তুমি বলতে দৈনন্দিন জীবনের আরও সব ছোটখাটো কাজের কথা,
যা থেকে বিশ্রাম নেবার জন্য তোমার
হাত দুখানি শেষ পর্যন্ত সরে গিয়েছে।

তখন আমার মনে হত, তোমার কথাগুলি যেন
শান্ত একটি স্রোতোধারার মতো
ধীরে-ধীরে বয়ে যাচ্ছে।
যে-স্রোতোধারা তার নিজেরই অজান্তে কখন
ফুটিয়ে তোলে বেগনিবরণ ফুলগুলিকে, আর
উপত্যকার বুকে আবার জাগিয়ে তোলে
নীল আকাশের মুখচ্ছবি।

বৃদ্ধের বিলাপ

আমার আগেই যদি ঈশ্বরের কাছে তুমি যাও,
তা হলে জানিয়ো তাঁকে, আমি খুব বুড়ো হয়ে গেছি।

(বোলো যে,) বেশ-কিছুকাল হল
পাখির ঝাঁকের ছায়া পড়ছে এসে জানলায় আমার।

ছাদ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে যে-বৃষ্টির ধারা,
(বোলো,) সে আমার সঙ্গে ভারী মৃদু কণ্ঠে কথা কয়।

(বোলো যে,) ফায়ার-প্লেসে ধিকিধিক এখনও আগুন
জ্বলে বটে, কিন্তু সে আমাকে আর উত্তাপ দেয় না।

(আরও বোলো,) বিনা প্রতিবাদে
শয্যাও চায় না নিতে আমার শরীর।

শীত আসে, কিন্তু সে আনে না স্থিতি কোনো,
সে বরং আলগা করে দেবে

বাড়ির দরজার সামনে পাথরগুলিকে।
শোকে মগ্ন হবে ওই ফলের বাগান।

আমার আগেই যদি ঈশ্বরের কাছে তুমি যাও,
তা হলে জানিয়ো তাঁকে, আমি খুব শিগগিরই আসছি।

বার্ধক্য

বার্ধক্য সুন্দর ভারী; যেন প্রায় আপেলেরই মতো।
নুয়ে-পড়া ডালে যে গোপনে পেকে ওঠে।
যে দেয় ফুলকে রসে-পরিপূর্ণ ফলের শরীর।
যেমন কোমলভাবে আমাদের অন্তঃস্থ শিশুর ক্রমে-ক্রমে
সম্পূর্ণ-মানুষ হয়ে ওঠা।
যেমন কোমলভাবে অনুভব করি পৃথিবীকে ;
রাত্রি নামে, দীর্ঘ পদক্ষেপে যেন অনন্তের সন্ধানে চলেছি।

এলাম আমরা কোথা থেকে

—কোত্থেকে এলাম ?
—সময়ের গর্ভ থেকে।
—আমরা কারা ?
—অসহায় মানুষের দল।
—চলেছি কোথায় ?
—যেখানে চলেছে এই হাওয়া।

প্রার্থনা

ঈশ্বর, তোমার কাছে মিনতি, আমার
জননীকে তুমি দয়া করো।
যদি তুমি প্রকৃত ঈশ্বর হও, তা হলে অবশ্য তুমি জানো,
দরিদ্র, নিঃসঙ্গ, পরিশ্রান্ত মানুষেরা
কত ক্লান্ত পায়ে এই পৃথিবীর পথে-পথে হাঁটে।

তোমার গির্জায় যাবে, আমার জননী সেই সময় পায়নি।
সকলের মুখে রুটি তুলে দেওয়া, ঘরবাড়ি পরিচ্ছন্ন রাখা,
ঘষামাজা, সেলাই-ফোঁড়াই অন্তহীন
পোশাক-আশাক—সব পরিষ্কার করা ভালবেসে।

হে ঈশ্বর, আমার মায়ের জীর্ণ হৃদয় ভেঙো না।
যদি তুমি প্রকৃত ঈশ্বর হও, তা হলে অবশ্য তুমি জানো,
মুখে তার ক্লান্তি, তাকে কত দুঃখ সইতে হয়েছে।

এও জানো, মা যখন তোমার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াবে, এবং
কেউ উচ্চারণ করবে তার নাম, যার সমার্থ যন্ত্রণা-অনটন,
নিমীলিত চক্ষু দুটি মা তখন তুলতেই পারবে না,
সামর্থ্য থাকবে না তার চক্ষু তুলে তাকাতে তখন।

মৃত মানুষেরা

সে তার দরজার ঠিক পিছনে মৃত্যুর
পদশব্দ শুনেছিল।
শুনতে পেয়েছিল, মৃত্যু কথা বলছে মৃত
মানুষের সঙ্গে।

দরজাটা যে ভাল করে বন্ধ করা হয়নি, তাও তার
জানা ছিল।
সে এও জানত যে, তার দরজার চাবিটা
রয়েছে মৃত্যুর কাছে।

কিন্তু মৃতদের প্রতি তার
ভালবাসা ছিল।
তাই নারীকণ্ঠ শুনতে পেয়ে
কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে তক্ষুনি সে তার
দরজা খুলে দিল। আর দেখল যে সেখানে

মৃত্যু নেই, মৃতেরাও নেই।
সে তখন রাত্রির ভিতরে
ঢুকে পড়ল, আর
পিছনে দরজাও ধীরে বন্ধ হয়ে গেল।

কুক্কুরী

তোমাকে একলা ফেলে কেউ যখন তোমার কাছ থেকে চলে আসে,
তখনই তুমি আবার ক্লান্ত সেই শিশুটির মতো হয়ে ওঠো ;
সেই শিশু, অনেক দূরের এক কুক্কুরীর
তীক্ষ্ণ কানে-তালা-ধরানো চিৎকার শুনে যে কিনা সারা সন্ধ্যাটাই
ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল।

কুক্কুরীটা সারাক্ষণই রয়েছে।
কিন্তু সে ডাকছে তোমারই রক্তমাংসের মধ্যে।

ঝর্নাতলার গলি

কষ্টের দিনে জন্ম আমার। কিন্তু
জন্মেছি আমি ঝর্নাতলার গলিতে।

মা-বাবার হাতে পয়সা ছিল না ; না-ই থাক্,
উপত্যকার চাদরটি ছিল শুভ্র।

দিল-নদী তার বক্ষ-বন্ধনীতে
ফুল ফোটাত, সে বাড়ির কাছেই বইত

মা আমার তার কলনির্ঝর যখনই
শুনতেন, গান গেয়ে উঠতেন তিনিও।

রং-মিস্তিরি বাবা উঠতেন আকাশে,
তাঁর মই যেন চড়ুইপাখির ডানা।

পাখির ঝাঁকের মাঝখানে তিনি শিখতেন
ভারী সুন্দর সুরেলা তাদের গান।

হাত দিয়ে নয়, রজ্জু দিয়েও নয়,
ওজনের টানে তিনি দোলাতেন আমার দোলনাখানি।

আর কী-বা চাও ? শুধু গান শুনে-শুনে
শিশু বড় হয়, ক্রমে বড় হয়ে ওঠে।

আমি গান গাই। মার্বেল নিয়ে খেলি।
বেঁচে থাক্ এই সুগন্ধী গুল্মেরা।

স্তোত্রের মতো বহু গান আমি গেয়েছি,
কখনও গেয়েছি বুকের কান্না ঝরাতে।

এপ্রিলে বন-কুসুম যেমন বাতাসে
কাঁপে, সেইভাবে কেঁপেছে আমার গান।

তা ছাড়া গেয়েছি শুধু গান গাইবার
আনন্দে, চলে জীবন যেমন পারা।

গেয়েছি, যখন নুয়ে পড়ে উলুবন,
যখন গ্রীষ্ম ছড়ায় জ্যোৎস্নাধারা।

এ তো সর্বদা একই আবেগের দোলা

এ তো সর্বদা একই আবেগের দোলা,
সর্বদা একই উৎসব।
আমরা দুজনে পরস্পরের বাহুবন্ধনে বন্দী,
একটি শরীরে জেগে আছে দুটি মাথা।

একটি হৃদয়, তাতে দুজনের স্পন্দন,
ঠোঁটেও একটি কথা।
একই তো চক্ষু, একই জ্বরে পুড়ি দুজনে,
দুজনের চুলে খেলা করে একই হাওয়া।

নিয়ত এমন ; এমনই প্রতিটি সকালে
আকাশটা করে শাখাপ্রশাখায় ঘোষণা :
আমরাই এই দিবসের অধিপতি।

এই এত ফুল, এই যে এমন আলো,
এই মেঘমালা এবং এই যে পৃথিবী
এরাও পেয়েছে আমাদেরই এই প্রণয়ের পূর্ণতা।

তাদেউশ রুজেভিচ-এর কবিতা

ভাষ্য ও ভাষান্তর ঃ ভাস্কর চক্রবর্তী

'আমার কবিতা', এরকম নামের এক কবিতায়, রুজেভিচ লিখেছিলেন যে তাঁর কবিতা ঃ কিছুই ব্যাখ্যা করে না, পরিষ্কার করে না, ত্যাগ করে না, জড়িয়ে ধরে না সবকিছু। ঐ একই কবিতায় তিনি আরো লিখেছিলেন যে তাঁর কবিতা ঃ খোলামেলা, রহস্যহীন।

১৯২১ সালে পোল্যাণ্ডের রাদোম্স্ক্-তে জন্মগ্রহণ করেন রুজেভিচ। কবিতা যে বিশাল ফাঁকি, এ কথা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। কবিতার থেকে কোনো সুযোগ-সুবিধা না নিয়েই তিনি সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর নিজস্ব প্রতিকবিতা।

হিংস্রতা আর মৃত্যু দিয়ে রুজেভিচ তাঁর কবিতায় ভানগুলোকে মুখোশহীন করেছেন। মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা বিস্ময়কর আর আন্তরিক। তাঁর যে কোনো অভিজ্ঞতাকেই তিনি কবিতায় ঠেলে দিতে পারেন। এবং তিনি তা করেনও। কবিতাকে কেন্দ্র করেও অনেক কবিতা লিখেছেন তিনি।

তাঁর গদ্যে তিনি জানিয়েছেন আমাদের—এখন পরিষ্কার যে, কবিতাকে ধ্বংস করা যাবে না। কবিতা সবসময়েই পুনর্জীবিত হবে, এমন কি গোপনতমরূপে।

পাগল মানুষজনদের আমি দেখি

পাগল মানুষজনদের আমি দেখি
শেষ আছে ভেবে যারা
সমুদ্রের ওপর দিয়ে হেঁটেছিলো
আর পৌঁছে গিয়েছিলো একেবারে তলায়

আমার অস্থির নৌকোটাকে
এখনো তারা দুলিয়ে দ্যায়

নিষ্ঠুরভাবে জীবন্ত আমি ওইসব কঠিন হাতগুলো
ঠেলে সরিয়ে দিই

বছরের পর বছর আমি ঠেলে সরিয়ে দিই তাদের।

কী সৌভাগ্য

কী সৌভাগ্য বনের ভেতর আমি
ফল কুড়োতে পারি
আমি ভেবেছিলাম
কোনো বন নেই কোনো ফলও নেই।

কী সৌভাগ্য আমি গাছের ছায়ায় একটু
শুতে পারি
আমি ভেবেছিলাম
গাছগুলো আর ছায়াই দ্যায় না।

কী সৌভাগ্য আমি তোমার সঙ্গে রয়েছি
সেজন্যেই বেজে উঠছে আমার হৃদয়
আমি ভেবেছিলাম
মানুষের কোনো হৃদয়ই নেই।

উষ্ণতা

তারপর এমনই শীতলতা
পৃথিবীটায় যে
মানুষেরা
এমন কি
নিজের ছেলেমেয়েদের দিকেই
উদাসীনভাবে তাকিয়ে থাকে

তুমি ঠিক একইভাবে
তোমার হাতদুটোর উষ্ণতার জন্যে
গরম কফিভর্তি কাপটা ব্যবহার করতে পারো

যে মুহূর্তে তারা জেগে ওঠে
টিন আর মরচের স্বরভঙ্গিতে তারা কথা বলে
তারা খনখন আর হিসহিস করতে থাকে

শিশুহত্যা

বাচ্চাগুলো চেঁচিয়ে উঠেছিলো 'মা!
কিন্তু আমি তো ভালো হয়েই ছিলাম!
অন্ধকার এখানে! অন্ধকার!'

ওদের দ্যাখো ওরা তলিয়ে যাচ্ছে নীচে
ছোটো ছোটো পাগুলো দ্যাখো
ওরা নীচে তলিয়ে গেছে তুমি কি দেখতে পাচ্ছো
এখানে-সেখানে
ছোটো ছোটো পায়ের ছাপ

সুতো আর পাথর
আর তারের তৈরী ছোটো ছোটো ঘোড়ায়
পকেট ঢাউস হয়ে আছে

জ্যামিতিক নক্শার মতো
বিশাল এক সমভূমি স্তব্ধ হয়ে গেল
আর কালো ধোঁয়ার এক গাছ
উল্লম্ব
মরা গাছ
যার মাথায় কোনো তারা নেই।

ভালোবাসা ১৯৪৪

নগ্ন অসহায়
ঠোঁটের ওপর ঠোঁট
চোখ বিস্ফারিত

উৎকর্ণ

রক্ত আর চোখের জলের একটা
সমুদ্রে
ভেসে যাচ্ছিলাম আমরা

সোনালি পাহাড়

প্রথমবার যখন
পাহাড় দেখি আমি
আমার বয়স
ছাব্বিশ

তাদের সামনে
আমি হাসি নি
চেঁচাই নি
আমি কথা বলেছিলাম ফিসফিসিয়ে

যখন বাড়ি ফিরলাম আমি
মাকে
আমি বলতে চেয়েছিলাম
পাহাড় ঠিক কীরকম

ব্যাপারটা বোঝানোই ভার
রাত্রিবেলায়
সমস্তকিছুই অন্যরকম
পাহাড় আর কথাও

মা চুপ করে ছিলেন
হয়তো ক্লান্ত
ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তিনি

নিরীহ চাঁদ মানুষজনদের
সোনালি পাহাড়
মেঘে মেঘে মিশে যাচ্ছিলো

মৃত্যু

দেয়াল জানলা
বাইরে
একটা শিশুর আধফোটা স্বর

জানলার নীচে একটা রাস্তা

একটা ট্রাম
ঢুকে পড়লেন রাজা হিরোড
দানবী মৃত্যু

আমি রাজাকে ছ-পয়সা দিই
আর পুরো ভিড়টাকে
হটিয়ে দিই

মৃত্যু
ব্যাপারটাই বাস্তব
পিছনে ফিরে তাকায়
আর ঝাঁকায় তার আঙুলগুলো

নতুন তুলনাসমূহ

কিসের সঙ্গে তুমি তুলনা করবে
দিন
এটা কি রাত্রির মতো
কিসের সঙ্গে তুমি তুলনা করবে
একটা আপেল
এটা কি একটা সাম্রাজ্যের মতো
কিসের সঙ্গে তুমি তুলনা করবে
রাত্রিবেলার
ব্যাপারটা
ঠোঁটগুলোর মধ্যবর্তী
স্তব্ধতা
মধ্যবর্তী
কিসের সঙ্গে তুমি তুলনা করবে একটা চোখ
অন্ধকারে বাড়িয়ে দেওয়া একটা হাত
ডান হাতটা কি বাঁ হাতটার মতোই
দাঁত জিভ মুখ
একটা চুমু
কিসের সঙ্গে তুমি তুলনা করবে
একটা পাছা

চুল
আঙুল
নিশ্বাস
স্তব্ধতা
কবিতা
দিনের আলোয়
রাত্তিরে

সবুজ গোলাপ

'মেয়েটি গোলাপটিকে সবুজ রঙের বুনেছিলো....'

বিশাল শহরগুলো
ভরে ওঠে
মানুষে
কমে যায় মানুষ
স্রোতটা ওঠে
আর নামে
মানুষের দঙ্গল
শহরগুলো একে অপরকে
কাছাকাছি নিয়ে আসে
ভেঙ্গে পড়াটা তুমি দেখতে পাও
এখানে সেখানে
ছড়ানো
শব্দগুলোর টুকরো টাকরায়
তুমি ভেতরটা কল্পনা করতে পারো
কিন্তু পিলপিল মানুষের এই দলে
রাণীহীন
আমাদের নিঃসঙ্গতা বাড়ে
নিয়ন আলোর নীচে
দূরত্ব ঘটে মানুষ থেকে মানুষে
মানুষ ঠাসা শহরে
একে অপরের ঘষটানিতে রক্ত টেনে নিয়ে
আমরা একটা দ্বীপে থাকি

হাত গুনতি কয়েকজনের দলে
আমরা কাছের দু-একজন পড়ে থাকি
কিন্তু তারাও
যে যার নিজের মতো চলে যায়
তাদের সঙ্গে তারা নিয়ে যায়
ভ্যাকুয়াম ক্লিনার্স নীরস সব চিত্রশিল্প
নারী ছেলেমেয়ে
মোটরগাড়ি ফ্রিজ
তথ্যভাণ্ডার
ছাই ছদ্মনাম
নান্দনিকের অবশিষ্টাংশ
বিশ্বাস
ঈশ্বরের মতো কিছু
ভালোবাসার মতো কিছু
তবুও অন্যেরা
দাঁতে মাংস নিয়ে
তাদের আস্তানায় চলে যায়
কমজোরিরা শুঁড়িখানার
টেবিলগুলোয় পড়ে থাকে
তারা তবুও
শব্দগুলোর সব ছায়ার ওপর ঝুঁকে পড়ে
কিন্তু এইসব শব্দগুলো এ্যাতোই স্বচ্ছ
তাদের ভেতর দিয়ে তুমি মৃত্যুকে দেখতে পাও
যাক্ গে
আমরা চললাম
আমাদের পা হেঁচড়ে ঠোঁটে তর্জনী
আর কেউ স্বীকার করে না সে চলে যাচ্ছে
ভালো হবে যদি ঝামেলা না করো
তাহলে সবাই বেঁচে থাকো অনেকদিন

তুমি মনে করে দ্যাখো
সর্বনাশা সেই পঁড়িনের দিনগুলোয়
আমরা খোলামেলা ছিলাম

অপরের যন্ত্রণা আর অপরের আনন্দ
সহজেই আমাদের ভেতরটা ছুঁয়ে দিতো
তোমাদের বেঁচে থাকা সমস্তদিক থেকে
ছুটে এসেছিলো আমার কাছে
এখন আমরা বর্ম দিয়ে ঢাকা
শুধু আমাদের মুখের
ফাটল দিয়ে
দেখতে পাই আমরা

মার্স

একটা ঘর

পাঁচ কি ছ'জনের
একটা সংসার

কেউ বই পড়ছে
কেউ ফটোগুলো দেখছে
কেউ যুদ্ধের কথা ভাবছে
কেউ ঘুমিয়ে পড়ছে চলে গ্যালো কেউ
কেউ স্তব্ধতায় মরছে
কেউ জল খাচ্ছে
কেউ পাউরুটি কাটছে
টমি A অক্ষরটা লিখলো
আর নীলরঙের নালওয়ালা একটা নাইট আঁকলো
কেউ চাঁদে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছে
কেউ একটা গোলাপ একটা পাখি একটা মাছ নিয়ে এসেছে
এখন বরফ পড়ছে
ঘন্টা বাজছে একটা

মার্স এসে হাজির হলেন
আর তাঁর তরবারি
আগুনে আগুনে
ভরে তুললো ঘর

আমি লিখছিলাম

এক মুহূর্ত অথবা ঘন্টাখানেক
আমি লিখছিলাম
গোধূলি রাত
আমি রেগে গিয়েছিলাম
কেঁপে উঠেছিলাম কিংবা বোবা
আমার নিজের পাশেই বসে পড়েছিলাম
চোখদুটো জলে ভরে গিয়েছিলো
বেশ কিছুক্ষণই আমি লিখছিলাম
হঠাৎ ঠাওর করে আমি দেখি
আমার হাতে কোনো কলম নেই

একজন কবি আর এক প্যাসেঞ্জার ট্রেনের প্রস্থান সম্পর্কে

ইয়েশি লিসোভস্কির জন্যে

তিনি জানেন না
তাঁর শেষ কবিতাটা কীরকম হবে
অথবা
কবিতাহীন পৃথিবীতে
কীরকম হবে প্রথম দিনটা

হয়তো বৃষ্টি পড়তে থাকবে
শেক্সপীয়রের অভিনয় হবে
আর বৃষ্টি

অথবা নুডলের সঙ্গে চিকেন সুপ
শেক্সপীয়রের অভিনয়
আর বৃষ্টি

কাব্যদেবীরা তাঁকে এমন কোনো আশ্বাসই দেননি যে
তাঁর শেষ নিশ্বাসের সঙ্গেই
তিনি মহান কোনো ভাবনা উচ্চারণ করবেন
স্বচ্ছ
আরো আলো অথবা ঐরকম কিছু

খুব সম্ভব
তিনি প্রস্থান করবেন
ঠিক একটা
সময়োত্তীর্ণ প্যাসেঞ্জার
ট্রেনের মতো
রাদোম্স্ক্ থেকে পারী
ভায়া জেব্শিদোভিৎসে

উদ্দাম স্বপ্নর চেয়েও দ্রুত

তাতাবানিয়ার খনিশ্রমিকদের শিশুদের প্রতি

সাত বছরের একটি মেয়ের
ড্রয়িং দেখেছিলাম আমি

ড্রয়িংটায় দোতলা একটা বাড়ি
সামনের দেয়ালে
আপনি দেখতে পাবেন
প্রত্যেকটা ইঁট আলাদাভাবে
সুন্দরভাবে নকশা-কাটা
বাড়িটার পাশে
একটা গাছ একটা কুকুর একটা কুয়ো
বাড়িটার ওপরে একটা পাখি
আর সূর্য
মেয়েটি গম্ভীরভাবে বলেছিলো
'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হলে
আমি এরকম একটা বাড়িতে থাকবো'

মাস্টারমশাই আমাকে ফিসফিসিয়ে বলেছিলেন
'মেয়েটি সবসময়ে জানলা
আর ইঁট
এত সুন্দর আর ঠিকভাবে আঁকে
এ জন্যে যে অন্ধকার ছোটো একটা বাড়িতে

সে তার আত্মীয়স্বজন সমেত এখন মাটি আর তক্তায়
দমবন্ধ একইসঙ্গে লেপ্টে আছে'
তারপর মেয়েটি আমার হাতটা ধরেছিলো
প্লিজ একবার দেখুন
বাইরের পাহাড়ের ওপর
নতুন বাড়িঘর উঠছে শ্রমিকদের
একটা ছাতের ওপর একগুচ্ছ ডালপালাকে
হাওয়া দুলিয়ে দিচ্ছে

রাভেন্নায় দান্তের সমাধি

দান্তে
এখানে কিছুই নেই
দেখুন এখানটা ফাঁকা
গাইডসমেত ভ্রমণ সবুজ চশমা
লাল চোখ নীল ঠোঁট
কমলা চুল
বোকা বোকা মাথা
মাথায় সুন্দর পালক
আসুন আমরা এগোই
একজন করে প্লিজ
কিছুই নেই ওখানে
চাবির গর্ত দিয়ে তারা দ্যাখে
Dantis Poetae Sepulcrum
একপায়ের পুরোনো এক কর্মী
যিনি দূরে এক কোণায় বসে আছেন
বিরক্ত হয়ে বলেন
ব্যস ব্যস
আর কিছুই নেই এখানে
ইস্পাতের শেকল
ব্রোঞ্জের মালা
Virtuti et Honori

বিনুনি

নিয়ে যাওয়ার পথে যখন সব মেয়েদেরই
মাথামুড়োনো হলো
চারজন শ্রমিক বার্চের ছোটো ডালপাতার ঝাড়ু হাতে
ঝাঁট দিলো
আর ডাঁই করে রাখলো চুলগুলো

পরিষ্কার কাচের পেছনে
পড়ে আছে রুক্ষ চুলগুলো
গ্যাসচেম্বারে দম যাদের বন্ধ হয়ে গেছে
পিন চিরুনি
জড়িয়ে আছে এইসব চুলে

এই চুলগুলো আলোয় ঝলমলায় না
হাওয়ায় এদিক-ওদিক ওড়ে না
স্পর্শ পায় না কোনো হাতের
অথবা বৃষ্টির অথবা ঠোঁটের

বিশাল সিন্দুকে
শুকনো চুলের মেঘ
দম যাদের বন্ধ হয়ে গেছে
আর ফিতে-বাঁধা
রঙচটা এক বিনুনি
কিছু ছেলেরা
যা ধরে স্কুলে টানতো

জীবনী থেকে

জন্মতারিখ
জন্মস্থান
রাদোম্স্ক্ ১৯২১

হ্যাঁ
আমার ছেলের স্কুলবইয়ের

এই পাতা
ধরে রেখেছে আমার জীবনী
এখনো কোথাও সামান্য ফাঁক পড়ে আছে সেখানে
কোথাও কিছু শূন্যস্থান

দুটো মাত্র বাক্য আমি কেটেছি
কিন্তু যোগ করেছি একটা
কিছুক্ষণের মধ্যেই
কয়েকটা শব্দে আমি লিখবো

তোমরা জানতে চাও
আমার জীবনের
আরো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আর তারিখ
অন্যদের জিগ্যেস করো

আমার জীবনী প্রায় শেষ হয়ে এলো
বিভিন্ন কাজে
কিছু ভালো কিছু খারাপ

কয়েকটি নক্ষত্র ও অসম্ভব উৎপলকুমার

সুমন গুণ

'অকিড সহজ ফুল—কিন্তু তারও জটিলতা চাই হাওয়ায়, বাতাসে' (অকিড, খণ্ডবৈচিত্র্যের দিন, ১৯৮৬)।

কথায় ও ব্যবহারে এই পর্যাপ্ত উচ্চারণ থেকে উৎপলকুমার বসুর ধক আমি টের পাই, দু'ভাবেই। লক্ষণীয়, 'চাই' শব্দটি। তা না হলে এতটাই মুখোমুখি এই বলা, যে, মুহূর্তেই বোঝা যায়, কোনো সহজ কুসুমের ভাঁজ ও বিভঙ্গ না খুঁজে স্বস্তি পান না উৎপলকুমার। তবে 'চাই' শব্দটি আরো দু'কথা বলার দাবি জানায়। প্রশ্ন ওঠে, জটিলতার অনিবারণীয় তাগিদ আছেই, তাকে সম্মত ইশারায় কিংবা উদাহরণের টানে প্রতিষ্ঠিত করাই এখানে লক্ষ্য, নাকি সহজ বৈভবের মাঁড়ে মাঁড়ে জটিলতাকে মাখিয়ে নেওয়া বাঞ্ছিত—এ কথাই জানাতে চান তিনি।

যাই হোক না কেন, অন্তত এটুকু বলাই যায়, যে, নিছক সহজের বদলে শাখা-প্রশাখাময় জটিল বুননের দিকেই উৎপলকুমার বসুর ঝোঁক। এবং তা এই উচ্চারণেই ঘটনাক্রমে প্রকাশিত। হাওয়া আর বাতাসকে আলাদা করে নেবার মধ্যেই এই মুখর রোমাঞ্চ, বোঝা যায়।

'সহজ, খুবই সহজ। এত সহজতা, হেসে উড়িয়ে দিতে গিয়েও
সন্দেহ হয়, এ কী সব জটিলতার সারাৎসার ?'

(একটি সকাল, বন্দরের কথ্যভাষা, ১৯৯৩)

রণজিৎ দাশ-এর এই সহমর্মী সংশয় থেকেও বোঝা যায়, জটিলতার পাখায় ভর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে এক অনিশ্চিত পাখি, তার চারপাশে প্রসঙ্গ নানারকম : ঈষৎ মেঘ, অচরিতার্থ হাওয়া আর অস্পষ্ট মানুষজন। 'লোচনদাস কারিগর'-এর প্রথম কবিতা : 'প্রকৃতি'। এতটাই ঝরোঝরো এর বিন্যাস, যে, বুঝে যাই তা 'জটিলতারই সারাৎসার'। নিরলঙ্কার 'শূন্যে ভাসমান' আগে গ্রাহ্য করি না। 'হায় রে' দু'বার গড়িয়ে ঘন হয়ে উঠবার আগেই 'ঘাসে ঘাসবীজ' সন্দেহাতীত হয়ে ওঠে। আবার পড়ে নিয়ে, তারপর থেকেই কবিতাটি টেনে নেয় প্রতিটি শব্দের ব্যাপকতায়।

কয়েক বছর আগে, উৎপলকুমার বসু তাঁর কবিতা প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন, যে, যে-কথা পংক্তিতে শেষ হয় তাকে শব্দবিশেষে ভ'রে দেওয়া যায় কিনা, দেখছেন তিনি। আমি কিন্তু, নিরাভরণের ধারণা, অন্তত তাঁর কবিতায়, হয়ত অন্যভাবে

বুঝি। শব্দ তুলে তুলে নিরাভরণ করার চেয়েও, তিনি, বরং এক টানটান বিবৃতির ধরনে লেখেন :

'আমাকে শেখাও ভাষা, যে-ভাষায় বিলেতফেরা হৃদরোগ-বিশেষজ্ঞ
ডাক্তার সেনের সঙ্গে মানুষী রীতার (পুরনো বান্ধবী, পাত্র চাই,
ছেষট্টির এম.এ.বি.টি.) গড়িয়াহাটার মোড়ে
কথা হয়েছিল' (বিজলীবালা, লোচনদাস কারিগর)

এই অমিতবাক ব্যবহারের স্তরে স্তরে কিন্তু রহস্যের সংযম। 'আমাকে শেখাও ভাষা' বলায় যে-আর্তি, যে-নিরীহ প্রার্থনার কৌণিক, তার সঙ্গে রীতাঘটিত বিজ্ঞাপনের নির্ণয়রচনা উৎপলকুমারেই সম্ভব।

এই ব্যবহারেই, মুখর চারপাশকে নিজের মতো করে নানারকমভাবেই ছুঁতে পারেন তিনি : '—সংযুক্ত মিকির ও উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলার ঘটনা সেবার কাগজে রিপোর্ট হয়নি—' লিখেই

'ডাক্তার জ্ঞান চৌধুরীর মধুর চিঠিখানি এখনো ভাঁজকরা ব্যাগে রয়েছে—উনি লিখেছেন : হি কামস্ ফ্রম এ গুড ফ্যামিলি—' (পকেটমার, খণ্ডবৈচিত্র্যের দিন)

প্রসঙ্গের যৌথ অভিজ্ঞান এভাবে, এত আয়োজন না করে ঘনিয়ে তুলতে পেরেছেন উৎপলকুমার ! মনে হতে পারে, একটু বেশি জায়গা নিল এই রহস্য সমাচার, তবে গন্তব্য বিচার করলে এই প্রশ্রয় গায়ে লাগে না।

তাছাড়া, তাগিদের রকমফেরে কবিতা কখনো গুটিয়ে আসে, কখনো ছুটে যায়। রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরীর 'মাংস' কবিতায় :

'মাংস—
কতো নাম : মাস, মাংস, পল, দ্রব্য, পিশিত, আমিষ।'

সমার্থক উচ্চারণের এই বিস্তার মানে পেয়ে যায় পরের লাইনেই :

'বোবার নিরীহ চোখ ক্রুর হয়ে উঠছে এখন।'

উৎপলকুমারের কবিতায় বিস্তৃতি মাত্রাও বাড়িয়ে নেয়। 'লোচনদাস কারিগর' ও 'খণ্ডবৈচিত্র্যের দিন' মিলিয়ে মোট ছটি কবিতা দেখা গেল, যেখানে একধরনের ঢালু সাবলীলতা আছে, তুলনায় কবিতাগুলো তাই একটু বড়ো।

আবার, 'খণ্ডবৈচিত্র্যের দিন' কবিতাটি ইশারায় কথা বলার মতোন, দ্রুত ও সংশ্লিষ্ট। প্রতিটি আলাদা কথাই এখানে ড্যাসচিহ্নসংলগ্ন, যেন, কোনো কথাই

চলকে না প'ড়ে একটি বাক্য থেকে অন্যটিতে গিয়ে মিশে যাচ্ছে। একদম শেষ লাইনে 'আজ জন্মদিনে' 'এই পঞ্চাশ বছরে' এসে সুডৌল বিরতিচিহ্নে বাঁধা পড়ে। এই কবিতাটি 'খণ্ডবৈচিত্র্যের দিন'-এর সবচেয়ে নৈর্ব্যক্তিক কবিতা বলেই মনে হয়েছে আমার। পুরো কবিতাটি এইরকম ঃ

ও, সবুজ খণ্ড হতে পারে—তাই উড়ে আসে ধর্মঘট
ঠোঁটে যার মৃতের স্ফটিকমাংস—ধানক্ষেতে এদিক-ওদিক
ছড়িয়ে পড়েছে শিরা—জাল যেন—ভোরবেলা ফাঁসি-বোনা-বাঁধা
শস্যের সবুজ—তার হাহাকার—তার বীভৎসতা—তার রক্ত-ঝরে-পড়া
ঐ উপহার—আজ জন্মদিনে—এই পঞ্চাশ বছরে।

লোচনদাস কারিগর ঃ (মার্চ, ১৯৮২)। প্রকাশক ঃ প্রশান্ত মাজী ও পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল। প্রতিবিম্ব প্রকাশনী।
খণ্ডবৈচিত্র্যের দিন ঃ (ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬)। প্রকাশক ঃ প্রশান্ত মাজী ও পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল। প্রতিবিম্ব প্রকাশনী।

সমগ্র রুচি, কবিতার ত্রাণ

প্রবুদ্ধ বাগচী

মাঝে মাঝে এমন হয়। পরিচিত বন্ধুদল থেকে সরে এসে নিজের চারপাশে গড়ে তুলতে ইচ্ছে করে বনবাসের এক যোগ্য আড়াল। সেই আরাধ্য আবরণের মধ্যে নিজের সঙ্গে একক বসবাস। আর, এই অবিচ্ছিন্ন অবসরের মুহূর্তগুলো ক্রমশ ঘনিয়ে ওঠে আত্মজিজ্ঞাসায়। চারপাশের কোলাহলময় ওঠাপড়া থেকে নানান পর্বে ছিটকে আসা প্রশ্ন, সন্দেহ অথবা বিদ্রূপ তাদের সমূহ অস্তিত্ব নিয়ে দাবি করে বসে অন্তর্গূঢ় বিশ্লেষণ। এমনই কিছু জিজ্ঞাসার মুখে পড়তে হয়েছিল সাম্প্রতিক এক সময়ে।

পরিচিত এক কবিতাপাঠক, এই সময়ের এক কবির কবিতা-ভাবনার পরিবর্তন ঘিরে তাঁর হতাশার কথা জানালেন খুব স্পষ্ট ভাষায়। অপর একজন, সাত দশকের এক পরিচিত কবিকে নস্যাৎ করে তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আর সমর্থন জানালেন অন্য একজনের প্রতি। ঘটনাদ্বয়ের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা হিসেবে বুঝতে চেষ্টা করছিলাম এই প্রতিক্রিয়ার উৎসটা। কবিতাপাঠক হিসেবে একথা কারোর অজ্ঞাত থাকতে পারেনা যে, কবিমাত্রেরই কবিতা রচনার প্রবাহে চেতনার পরিবর্তন একটা অনিবার্য প্রক্রিয়া। আসলে এই হতাশার যে কথা ব্যক্ত করলেন তিনি, তার সূত্র সম্ভবত এটাই যে, যে বিশেষ রচনাভঙ্গিমা কিংবা বিষয়ভাবনা নিয়ে এতোদিন লিখে চলেছিলেন এই বিশেষ কবি, তার সঙ্গে মানসিক সাযুজ্য ছিল এই পাঠকের। বর্তমান ভাবনার ক্ষেত্রে তাঁর মানসিক বিরাগ তাঁকে নিয়ে আসছে হতাশার কিনারে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও চিন্তাক্রম প্রায় সমধর্মী। খুব স্বাভাবিকভাবে, যে কবির রচনায় তিনি স্ব-মতের বিস্তার খুঁজে পেলেন, তাঁকে তিনি অকুণ্ঠিত বিচারে গ্রহণ করলেন।

কিন্তু একজনকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অর্গলহীন এই যে প্রচেষ্টা, তার পাশাপাশি অপরজনকে সরিয়ে রাখতে হবে সম্পূর্ণ বিচার সীমানার বাইরে? অথবা, ব্যক্তিমতের সপক্ষে জড়ো করা কবিতার এই বলয়ে আদপে কি সৃষ্টি হবে না কবিতার একটা তুমুল বিভাজনরেখা? যেন অনেকটা ঠিক রাজনৈতিক জগতের দলীয় সংকীর্ণতার মতো পরিবেশে আমরা কি তবে এইভাবে অভ্যস্ত হয়ে উঠবো এ-দলের কিংবা ও-দলের কবিতায়? এই দলীয়তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে জমা হবে উপদলীয় বৃত্ত, তারও মধ্যে আরো আরো অসংখ্য গোষ্ঠীবদ্ধতা! কবিতার অখণ্ড মানচিত্র ক্রমে পরিণত হবে পরস্পর বিবদমান প্রতিস্পর্ধী কিছু খণ্ডিত চিত্রমালায়?

মানি কিংবা নাই মানি এমন এক সম্ভাবনার দুর্যোগের সামনে কিন্তু আজ আমরা এগিয়ে চলেছি অল্পে অল্পে। বিহ্বল হয়ে তাকিয়েছিলাম এই দীর্ণ এক ভাবনাকে বুকের গোপনে লুকিয়ে রেখে। অবসরের মাধুর্য ভরে উঠছিল আশংকায় ; কবিতা-পাঠক হিসেবে নিজস্ব হতোদ্যম খুঁজে পেতে চাইছিল এই আবিল প্রবণতাগুলোর বিপ্রতীপ কোনো এক উপকূল যেখানে শীতল প্রশ্রয় পাবে আমার মূল্যায়নটুকু। আর, এভাবেই হয়তো এই ভয়াবহ স্রোতের মুখে গড়ে দেওয়া যাবে প্রতিবাদের বাঁধ, সামান্য হলেও যা হয়ে উঠতে পারে বিশেষভাবে তাৎপর্যময়।

ব্যক্তিমনের উঠোন জুড়ে যখন এমন ঝড়-বাদল, তখনই অকস্মাৎ ফিরে পেলাম এক প্রত্যয়ের ভূমি। নিরুচ্চার অস্তিত্ব নিয়ে সরে থাকার মুহূর্তে শুনতে পেলাম বলিষ্ঠ প্রজ্ঞার এক স্বরলিপি।

দীর্ঘকাল ধরে এই প্রিয় কবি কবিতার পাশাপাশি নানান চিন্তাবাহী প্রবন্ধের আদলে আমাদের শুনিয়ে চলেছেন অনেক জরুরি কথাবার্তা। বারবার, অনেক সংকটের মুহূর্তে চেতনার ত্রাণ নিয়ে হাজির হতে দেখেছি তাঁকে অজস্র রচনায়, বহুক্ষেত্রে তাঁর কাছে ফিরে গিয়েই আমাদের নতুনভাবে প্রস্তুত করতে হয়েছে কবিতার মুখোমুখি দাঁড়ানোর অবলম্বন। এই বিশেষ ক্ষেত্রেও যখন নিজের মধ্যে টানা-পোড়েনের এক অন্তর্হীন বিস্তার, ঠিক তখনই 'রুচির সমগ্রতা'র স্বরূপ খুঁজে পেলাম তাঁর এই শিরোনামাঙ্কিত রচনায়।

তাহলে প্রায় দু-দশক আগেও এমনই সব চিন্তায় আর প্রবণতায় আচ্ছন্ন হয়েছিল বাংলা কবিতার পাঠক? অনায়াসে তাঁরা জীবনানন্দকে গ্রহণ করতে গিয়ে সরিয়ে রাখছিলেন বুদ্ধদেব বসুকে, অথবা বুদ্ধদেব অনুরাগীরা বাতিল করতে চাইছিলেন বিষ্ণু দে'র কোনো সদর্থক ভূমিকা! এর একটা সম্ভাব্য বিশ্লেষণ সেদিন হাজির হয়েছিল শঙ্খ ঘোষের কলমে '....রুচির এক-একটা বিশেষ আদল গড়ে ওঠে পাঠকের মনে, হয়তো কোনো সামর্থ্যবান কবিই তৈরি করে দেন সেই আদলটি, আর, তার বাইরে ভিন্ন রুচির কবিতাকে নিজের মধ্যে নিতে পারা যেন অসম্ভব মনে হয় তখন। এক কবিকে মনে হতে থাকে আরেকজনের বিপরীত কিংবা বিরোধী, একজনের প্রতি আনুগত্যের সততায় অন্যজনকে লক্ষ করা তখন শক্ত হয়ে ওঠে।'

সন্দেহ নেই, পাঠকের ক্ষেত্রে এটা একটা ভয়াবহ ত্রুটি। কবিতা যদি হয় আত্মপ্রকাশের এক অমোঘ মাধ্যম, জীবনের পটভূমিতে এই আত্মউন্মোচন একেক কবির হাতে ঘটবে একেক ধারায় এইটেই সহজাত আর স্বাভাবিক। বাংলা

কবিতার আধুনিক ইতিহাসও আমাদের সামনে নিয়ে আসে এই সহজ সত্যটাই। রবীন্দ্রনাথ যেভাবে তাঁর রচনায় মেলে ধরেছেন স্বাতন্ত্র্যের ধারণা, জীবনানন্দের সঙ্গে তার পার্থক্য দুস্তর। আবার, জীবনানন্দ কিংবা রবীন্দ্রনাথকে পেরিয়ে সম্পূর্ণ অন্য এক পথে হেঁটে এসেছেন বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে অথবা সমর সেন। হয়ত বাংলা কবিতার প্রাণস্পন্দন রুদ্ধ হয়ে যেত যদি না এরপরেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় বা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অথবা রাম বসু, মণীন্দ্র রায়'রা নিয়ে আসতেন নতুন এক পরীক্ষার প্রয়াস, অথবা তাঁদের ছাড়িয়ে নতুন এক ঘরাণায় কথা বলে উঠতেন সুনীল, শক্তি বা শঙ্খ ঘোষ। এই পরিবর্তনের ধারাবাহিক জোয়ার ষাট-সত্তর-আশি পেরিয়ে ধাক্কা দিচ্ছে একেবারে নব্বই-সংলগ্ন এই সময়কে। আরো একটা বিষয়, সমসময়ে অবস্থান করেও নির্দিষ্ট একটা ধারাবৃত্ত তৈরি হয়ে যায় একেকজনকে ঘিরে, জীবনকে দেখার এক নির্দিষ্ট কৌণিক অবস্থান আলাদা করে চিনিয়ে দেয় তাঁকে। তাহলে কি করবেন কবিতার পাঠক? কোনো বিশেষ কবিকে ভালোলাগার সূত্রে বারেবারে এড়িয়ে যাবেন অন্যদের, আর এইভাবে একমাত্রিক এক বিচারের মাপকাঠিতে চিহ্নিত হবে কবিতা! সাধারণ পাঠকের ক্ষেত্রে এই বিভ্রান্তি ঘটে চলেছে আজও। আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য, বেশ কিছু কবিকেও আজ দেখতে পাচ্ছি এমন এক বিপজ্জনক চর্চায় নিরলস থাকতে। একেবারে নিজস্ব মতানুসারীদের একত্রিত করে অবাধে তাঁরা রাত্য করে তুলছেন অন্য অনেক সম্ভাবনাকে।

তবে কি ধরে নেব, আজকের সামাজিক-ঐতিহাসিক পটভূমিকায় এইই আমাদের সাধারণ বাসনা যে, কবিতায় আমরা খুঁজে ফিরব কোনো বিশেষ মতাদর্শের সমর্থন মাত্র! আমরা কবিতা পড়ব নিজের পছন্দকে অনুসরণ করে, এই প্রশ্নে দ্বিমত নই, কিন্তু সে চর্চা কি নিছক একমুখী এক অভ্যাস? ধরা যাক, আমি এমন ধারণা করি যে, ছন্দের এক বিশেষ ধারায় যে কবিতা লেখা হবে কেবল তাই আমার পাঠ্য অথবা আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এই মর্মে যে রোম্যান্টিক কবিতা বাদ দিয়ে আমি খুঁজে নেব সামাজিক বিষয়ভাবনার কবিতা। কিন্তু তার মানে কি এই সীমায়িত পরিচারের বাইরে যা কিছু কবিতা তা'ই আমার কাছে পরিত্যাজ্য? আজকে বোধহয় এমনই এক শুচিবায়ুতায় আমাদের আচমন।

একটা প্রবণতা প্রথম থেকেই দেখা গেছে যে, নিছক একটা তত্ত্বগত মুখোশের আড়াল থেকে বিচার করার অবকাশে অনেক ক্ষেত্রে তৈরি হয়ে গেছে ভুল বিচার-বোধের এক আদল। স্মরণে আসবে, সমকালে জীবনানন্দ স্বয়ং আক্রান্ত হয়েছিলেন অশ্লীলতার অভিযোগে, এমন কি রেহাই মেলেনি রবীন্দ্রনাথের

ক্ষেত্রেও। পরবর্তী সময়ে, লক্ষ করা গেছে চল্লিশের প্রগতিপন্থী কবিরা অনেক সময় এড়িয়ে থেকেছেন অন্য ভাবনাবাহী কবিতাকে, পঞ্চাশের 'হাংরি'-রা ইন্দ্রিয়সর্বস্ব কবিতার পৃষ্ঠপোষকতার সূত্রে নস্যাৎ করতে চেয়েছেন অগ্রজদের। সত্তরের রাজনৈতিক কবিরা প্রত্যাখ্যান করেছেন প্রেম-প্রীতি-নিসর্গের অনুপ্রবেশ, সরাসরি বুর্জোয়াবিলাস বলে চিহ্নিত করেছেন এমন কবিদের। এর সবটাই প্রত্যক্ষ, আর এইভাবে তৈরি হয়ে উঠেছে বাংলা কবিতার এক বৈচিত্র্যময় প্রেক্ষিত। এই বিরাট পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে আজকের পাঠক তাই নির্বাচন করে নিতে চাইছেন নিজস্ব এক কাঠামো, যা একেবারে তাঁর নিজেরই মতো অবিকল।

যাঁরা মূলত রাজনীতির জগতের বাসিন্দা, লক্ষ করেছি তাঁদের মধ্যে খুব সহজে কাজ করে এমন একটা বিভাজনের ধারণা। আসলে স্ব-দলীয় ভাবনার আলোয় তাঁরা ধরতে চান মানুষকে, তার চিন্তাকে। আজ এই প্রবণতা সংক্রামিত হয়ে আসছে কবিতার পাঠকের ক্ষেত্রে যখন খুব প্রবলভাবে, তখন সংগত অর্থেই এই প্রশ্ন তুলে আমাদের অভ্যাসের ভিত নাড়িয়ে দিতে পারেন শঙ্খ ঘোষ '....কবিতা পড়ি কি আমরা নিজেদের মতি বা বাণী তৈরি করবার জন্য? আমরা কি কেবল আমাদের মতের সমর্থন খুঁজে বেড়াই কবিতায়?' প্রশ্নগুলো যে নতুন, এমন কথা বলতে চাইছি না। তবে সাম্প্রতিক সময়ের এই সংকটের মুখে নতুন মাত্রায় সাজিয়ে দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে এই সব নানান প্রশ্নগুলোকেই। কারণ, যে পাঠক এভাবে তৈরি করে ফেলেছেন ভুল অভ্যাসের এমন সীমানা, তার কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ছে এই সত্যটুকু যে, 'কবিতা কেবল মতের সমর্থন নয়, বাণীর মহিমাই কবিতার মহিমা নয়।' কবিতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে কবি-মনের এক জটিল জটিলতম প্রতিক্রিয়া, তাঁর অভিজ্ঞতার এক সম্প্রসারিত ইতিহাস। আর, কবিতা একরকম নয়, বহুধা তার প্রকাশ। চারপাশের যাবতীয় ঘটমান প্রবাহের সারাৎসার মাত্র নয়, তার সঙ্গে কবিহৃদয়, মেধা, অনুভবের সার্থক সমীকরণে তৈরি হয় কবিতার ভুবন। আর এর সবটুকু নিয়ে তৈরি হয় কবিতার সামগ্রিক একটা প্রেক্ষিত।

সমান্তরালে এমন একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন এই বিচ্ছিন্ন নির্বাচনের প্রবণতা? কেন এই একপাক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্রয়! আসলে, একটা বিষয় তো স্পষ্ট যে, নানান কবি তাঁর ব্যক্তিগত ঘরাণায় তৈরি করে নেন তাঁর নিজস্ব কবিতার ধরন, একটা নির্দিষ্ট স্টাইল। যেভাবে বিষ্ণু দে গড়ে তোলেন মেধানির্ভর এক স্বরায়ন ঠিক তার বিপরীতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় তৈরি করেন আটপৌরে গদ্য-চাল অথবা অরুণ মিত্র কিংবা অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত পেরিয়ে একবারে রাজনীতি

ভাবনায় প্রত্যক্ষ মণিভূষণ ভট্টাচার্য। আরো এগিয়ে এসে চিনে নিতে পারি জয় গোস্বামীর লিরিক্যাল মেজাজের পাশে সুবোধ সরকারের প্রতিকবিতার নির্মাণ। যেভাবেই যাই, খুঁজে পাবো জীবনকে দেখার এক বিশেষ কোণ, বিশেষ প্রকাশ। এখন আমরা যদি ভেবে নিতে থাকি, কোনো বিশেষ উচ্চারণই জীবনের কাছে আমাদের একমাত্র প্রত্যাশা, যদি আমরা ভাবি মেধা কিংবা হৃদয়, স্বচ্ছতা বা রহস্যময়তা, রোম্যান্টিকতা বা সমাজমুখিতার মধ্যে পড়ে রয়েছে কোনো দুস্তর সীমারেখা, তাহলেই আমরা এগিয়ে যেতে থাকবো বিচ্ছিন্ন নির্বাচনের দিকে। এই বিচ্ছিন্ন আসক্তিকেই ক্রমে আমরা ভেবে নেবো সবটুকু জীবন হিসেবে আর সেই গণ্ডির মধ্যে মতের ঘেরাটোপে আমরা ধরে নিতে চাইবো কবিতার সমগ্রতাকে। এইখানে এক চূড়ান্ত পদস্খলনের সম্ভাবনা ঘনিয়ে আসবে এইভাবে।

সত্যিই কি এমনভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা চলে বহুগামী মানসিক বিকাশকে? আর, আরোও একটু বাড়িয়ে নিয়ে যদি ভাবি তাহলে তো স্পষ্ট দেখবো প্রতিটি শিল্পমাধ্যমই আদপে ছুঁতে চায় এক সমগ্রতাকে। কবিতার মতো মহান সম্ভাবনাপূর্ণ মাধ্যমের কাছে এই প্রত্যাশাটা যেন আরো মাত্রাধিক। এই বক্তব্যকেই হাজির করা হয়েছে আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধের অবয়বে যেখানে এর্নস্ট ফিশারের দৃষ্টান্তের প্রসঙ্গে লেখক জানান: 'পরস্পরের সমস্যা, উদ্দেশ্য আর আকাঙ্ক্ষাকে বুঝবার চেষ্টা করাই সাম্প্রতিক সাহিত্যশিল্পের সবচেয়ে বড়ো কাজ।' যদি এই দায়কে সত্য বলে স্বীকার করি, তাহলে তো আমাদের সর্বদাই ভাবতে হবে একটা সম্পূর্ণ প্রেক্ষিতকেই। বারেবারে খুঁজে পেতে হবে সেই যোগসূত্রটুকু যার দর্পণে আমরা চিনে নিতে পারবো গদ্যছন্দের অরুণ মিত্র কিভাবে পরিপূরক হয়ে ওঠেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের আর কিভাবেই বা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিক ভাবনা হাত ধরে থাকে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্বদেশ ভাবনার। অথবা আধুনিক কবিতার ঐতিহ্যকে অটুট রেখে কিভাবে তার পাশে পূর্ণ সম্ভাবনা নিয়ে বেড়ে ওঠে প্রতিকবিতার ধারা, কিভাবে লিরিক্যাল বিষয়ভাবনা জড়িয়ে থাকে সাম্প্রতিক কবিতায় মহাজাগতিক বীক্ষাকে।

আপাতবিচারে একে একটা অসম্ভব বিষয় বলে ভেবে বসতে পারেন আমাদের অনভ্যস্ত কোনো পাঠক। অথবা কোনো একদেশদর্শী কবি। কিন্তু, স্মরণে নিয়ে আসতে হবে, এটা একটা বিস্তৃত ধারাবাহিকতার অঙ্গ মাত্র, একটা নতুন অভ্যাসের নতুনরকম প্রস্তুতি, এক অর্থে নতুন একটা আবিষ্কার। মুহূর্তের বিচার তাকে লঘু করে দেবার সম্ভাবনা রাখে, এটা আরও তীব্রতর ভাবনার দাবি করে।

ব্যক্তিগত পর্যায়ের যে দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভ আমাকে টেনে এনেছিল এই বিশেষ

রচনার পাশে, ভাবনাবিন্যাসের আলপনায় এখন তা অনেকখানি প্রশমিত। সেই পরিচিতজনের যে আক্ষেপ জিজ্ঞাসায় ভরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল আমায়, এই 'রুচির সমগ্রতা'র সামনে তার সম্পূর্ণ নিরসন ঘটে। যখন এমন সব ত্রুটির দিকে ঘুরে যায় চোখ, যেভাবে তাকে চিনিয়ে দেন শঙ্খ ঘোষ—'অনেক সময় চলে যায় এই সত্য মর্মে নিতে যে হৃদয় আর মেধা, জাদু আর যুক্তি, রহস্য আর স্বচ্ছতা, ব্যক্তি আর সমাজ, শমতা আর ক্ষোভ, নম্যতা আর বিদ্রোহ, আসক্তি আর বিদ্রূপের মধ্যে নিরন্তর যাওয়া আসা করেই বেঁচে আছে আমাদের নানা মুহূর্তের খণ্ডতা, এই খণ্ডতাগুলি পরস্পর সম্পৃক্ত হয়ে বেঁচে উঠতে চায় কোনো এক সমগ্রের দিকে।' এই উচ্চারণের ভেতরে ভেতরে আমার মধ্যে জেগে ওঠে পরিচ্ছন্ন আর বোধ্য এক যুক্তিবিন্যাস।

তাহলে, এই বক্তব্যেরই ধারাবাহিকতায় আমাদের জেনে নিতে হবে নির্দিষ্টভাবে আমাদের কর্তব্যের রূপরেখা। প্রতিটি বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের সংশ্লেষে আমাদের তৈরি করে নিতে হবে সমগ্র কবিতার চালচিত্র। ঠিক যেভাবে বলেছিলেন সমকালের এক তরুণতম কবি। বছর দুই আগের এক কবিতা সভায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন, আমরা যে যেখানে যেমনভাবে কবিতা লিখে চলি তার সমষ্টিগত ঘাতে তৈরি হয়ে যায় মহাকাব্যিক এক স্পন্দন, আমরা প্রতিটি একক সেই মহাকবিতার এক অণু-স্রষ্টা মাত্র! পাঠকের সামনেও আজ এই মহত্তম অন্বেষণ!

তবু একটা মৃদু আক্ষেপ। মানতে অসুবিধে নেই, একেবারে সাম্প্রতিক সময়ের জরুরি সমস্যার আলোয় পুনরাবিষ্কার করেছি দু-দশক আগের এক রচনাকে, এতে সেই রচনার গৌরব বেড়ে চলে বহুলাংশে। কিন্তু দীর্ঘ দু-দশক আগে যে সমস্যার সম্ভাবনায় কলম ধরেছিলেন আমাদের এই প্রাজ্ঞ কবি, আজ সেই একই সমস্যায় বিদীর্ণ হয়ে আমাদের ফিরে আসতে হল সেই তাঁরই আশ্রয়ে। বর্তমান সময়ের বিস্ফারিত লেখালেখির পরিসরে কেন কোথাওই খুঁজে পাওয়া গেল না সচেতন ভাবনার এই পরিচয়? শঙ্খ ঘোষের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেও এই জিজ্ঞাসা একটা বড় বিস্ময়ের বেদনা খুঁড়ে আনে। কোথায় এই গাঢ় নির্লিপ্তির পরিত্রাণ?

সময়ের প্রতিচ্ছবি ঃ শঙ্খ ঘোষের সাম্প্রতিক কবিতা

বাসবী চক্রবর্তী

এবার আসোনি তুমি সাবলীল কালো জলাধারে
এবার আসোনি তুমি মেঘাতুর পাহাড়চূড়ায়
আমার গরিবজন্ম তোমাকেও করেছে গরিব
এবার বৃষ্টির দিনে বসে আছো চায়ের দোকানে।
ঘর করা হলো কি না বলে একজন, অন্যজনে
আজও খুঁজে ফেরে মুখ মিছিলে যা হারিয়ে গিয়েছে,
কারো মুখে বর্ণাচ্ছ, বঙ্গদর্শনের পাতা খুলে
ভাবে কোন্ আন্দোলনে নিশ্বাস ফেরাবে পৃথিবীর।

(২৯ / গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ)

কবিতাটি পড়ার পর এই অষ্টম লাইনে এসে আটকে যায় চোখ—'কোন্ আন্দোলনে নিশ্বাস ফেরাবে পৃথিবীর'। এই শতাব্দীর সাক্ষী দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ আর কতো ছোট বড় সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন, কিন্তু সময়ের গায়ে তার ছায়া কোথায়? সত্যি বলতে, এ কোন্ সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি আমরা? যখন চেনা মুখগুলোকে অচেনা লাগে, যখন বিশ্বাসহীনতা, অবক্ষয় আর মূল্যবোধের ভাঙ্গনের পাশে আমাদের দিনযাপন প্রতিদিনই ক্লান্ত করে আর কেবলই জিজ্ঞাসা-চিহ্নের পাশে দাঁড় করিয়ে দেয়—'আমি কি জানি নি ভাবো কারা শুধু ছলশব্দ তুলে / ভরে দেয় তাঁবু? কারা আড়ালে ছুরিতে দেয় শান? / চুমু খেতে গিয়ে কারা ঠোঁটের ভিতরে ঢালে কষ / আলিঙ্গনে বাঘনখ?'[২২] তবু এই অসঙ্গতি আর ভাঙাচোরা সময়কে পকেটে পুরেই জীবনের স্রোতে গা ভাসায় মানুষ। কিন্তু যে ব্যক্তি-মানুষ সমাজমনস্ক, পরিপার্শ্ব থেকে মুখ ঘুরিয়ে বেঁচে থাকা যার কাছে অর্থহীন, বিবেক নামক অন্তঃস্রোত যাকে ধাক্কা মারে প্রতিনিয়ত—তাকে তাড়া করে নানা প্রশ্ন—'তাহলে কি করতে বলো? অন্ধ হয়ে শুয়ে থাকব ঘরে' —এইসব কবিতাংশ অনিবার্যভাবে উঠে আসে আমাদের জোড়াতালি দেওয়া সাম্প্রতিক জীবনে এবং বিস্মিত হতে হতে আমরা মিলিয়ে নিই আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে কবিতার সত্যতা, কারণ 'সত্যি কথা বলা ছাড়া আর কোন দায় নেই কবিতার'—এই উচ্চারণ তো কবি শঙ্খ ঘোষেরই।

কবিতার গায়ে এসে পড়া এই দ্যুতি, যার সঙ্গে অমোঘভাবে মিশে আছে সময়, জীবন, সমাজচেতনা, দেশভাবনা—তার সঙ্গে পাঠক হিসেবে আমাদের পরিচয়

তো নতুন নয়, সেই কবে ছাত্রজীবনে হাতে তুলে নিয়েছিলাম একের পর এক কবিতার বই, আর জেগে-ওঠা বিস্ময়ের পরতে পরতে ধরা দিয়েছিল সেইসব আশ্চর্য পংক্তি—

আর সবই থেমে-যাওয়া চোয়ালে-চোয়াল-জাগা
উচ্চাশার ঝুল লাগা
নেমে যাওয়া ভাঙ্গা বর্ষার প্লাবনশেষে ম্যানহোল থেকে
তোলা অন্ত্রময়
ভয় আর ধ্বস্তদেহ ফেলে রেখে ছুটে যাওয়া টায়ার টায়ার
ব্রিজ ধ্বস্
আর সবই শহরের কবিতা, কেবল এইটে প্রান্তরের।
(গঙ্গাযমুনা/মূর্খ বড়ো সামাজিক নয়)

কিংবা

তোমার কোনো বন্ধু নেই, তোমার কোনো বৃত্তি নেই
কেবল বন্ধন
তোমার কোনো ভিত্তি নেই তোমার কোনো শীর্ষ নেই
কেবল তক্ষক
তোমার কোনো নৌকো নেই তোমার কোনো বৈঠা নেই
কেবল ব্যাপ্তি
তোমার কোনো উৎস নেই, তোমার কোনো ক্ষান্তি নেই
কেবল ছন্দ
(তক্ষক/বাবরের প্রার্থনা)

'দিনগুলি রাতগুলি' (রচনা ১৯৪৯-৫৪/প্রকাশ : ১৯৫৬) থেকে 'গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ' (১৯৯৪)—সময়ানুক্রমিক হিসেবে সৃজনশীলতার এই পরিসর তো ব্যাপ্ত, যদিও সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থে কবি জানিয়েছেন, 'আলিঙ্গন ছোট', তবু আমাদের বিশ্বাস বিস্তৃত তাঁর কবিতার ভুবন—যেখানে একাকার হয়ে আছে সময় ও জীবন, যেখানে মানুষ ও মানবিক চেতনাই প্রাধান্য পায়, সেখানে রচিত হয় মানুষের স্তব। শঙ্খ ঘোষের অনুভবে....'আমার কাছে আধুনিকতার একমাত্র মানে মানবিকতা। ....যে মানুষ বেঁচে আছে তার অসংখ্য অপূর্ণতা নিয়ে, মৃত্যু আর প্রকৃতি দিয়ে পদে পদে খণ্ডিত যে মানুষ তারই মধ্যে দিয়ে নিজের বিকাশ খুঁজে চলেছে....তার সেই চলনটাকেই বলি মানবিকতা। ....সেই মানবিকতার চর্চার মধ্যেই আছে যোগ্য আধুনিকতা।'[১] শঙ্খ ঘোষের কবিতায় মানুষ খুঁজে পায় মানুষের ছবি—

যেসব মানুষ নেই যেসব মানুষ মরে গেছে

যেসব মানুষ তবু কথা বলেছিল একদিন
দ্বাদশীর রাতে তারা আমার বাঁকের কাছে এসে
সরাসরি প্রশ্ন করে : বলো কাকে বলে বহমান। (২৪)

আর—

যেসব মানুষ তবু ভুলে থাকে, যেসব মানুষ
ছেঁড়াজবা নিয়ে আজও আসে না এ জলের কিনারে
তাদের সবার শিরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘোলা স্রোতে
সকালবেলার বিষ
সকালবেলার বিষ রোজ আমি ছুঁয়ে গেছি ঠোঁটে। (২৪/গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ)

তবে বহমান জীবন, পরিপার্শ্ব বা সময় থেকে তো আলাদা করে ভাবা যায় না মানুষকে, তাই শঙ্খের কবিতায় মানুষের মুখচ্ছবির পাশাপাশি পাই চলিষ্ণু সময়ের ছবি। তবে কোন সময়? এমন এক সময় যখন "সত্যকে আজ ঘুরিয়ে নিলে এক লহমায় মিথ্যে। আর মিথ্যেকেই বানিয়ে নিই সত্য।" এই সময়টাই নাড়া দিয়ে যাচ্ছে আমাদের সত্তাকে, আমূল কাঁপিয়ে দিচ্ছে আমাদের অস্তিত্বকে—এই অস্থির সময়ের ডানাকে পরম বিশ্বস্ততায় ছুঁয়ে আছেন শঙ্খ ঘোষ, কারণ তাঁর মতে, "কবি কখনোই ভুলে যান না যে একহাতে এই দেশনিহিত কাল আর অন্য হাতে দেশোত্তর কাল ধারণ করার মুহূর্তেও তিনি পা রেখে দাঁড়িয়ে আছেন অস্থির সমসময়ের সংকটের উপর।"[২] সংকটময় অস্থির সময় জীবন্ত হয়ে উঠে এসেছে তাঁর কবিতায়—

কাগজ যদিও, তবুও বাঘ।
ছেড়ে দেব? না কি মানাব বাগ?

এখন বুঝেছি আসল দোষী,
অসির চাইতে ধারালো মসী। (বাঘ/বন্ধুরা মাতি তরজায়)

১৯৯৩ এ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থে আমরা পেলাম আরও জীবন্ত কবিতা—

আমি যখন মারছি তোমায়
বুঝতে হবে সেসব সময়
মরছ কেবল নিজের নিজের
বোমায়
গোটা মগজ আমায় দিয়ো
তবেই হবে দেশপ্রিয়

দেশও হবে অবিস্মর
ণীয়
এই কথাটা ইতস্তত
ছড়িয়ে দিলে গানের মতো
মনের মধ্যে থাকবে না আর
ক্ষত ! (গানের মতো/লাইনেই ছিলাম বাবা)

এইরকম সব জীবন্ত কবিতা ধারণ করে আছে সাম্প্রতিক সময়ের বিভিন্ন নিষ্ঠুর ঘটনা, নানা অন্যায়—যেগুলো আমরা দেখে চলেছি প্রায় নীরব দর্শক হয়ে—

ধরো কেউ নিজে থেকে দিতে চায় সব তা বলে কি
বসে থাকা সাজে ? তার টুঁটি ছিঁড়ে নিয়ে এসো কাছে
আমাকেই বলতে পারো ঈশ্বরের প্রথম শরিক
করতে পারি সব যদি সঙ্গে থাকে সপ্রেম বুলেট
ক্ষমতার উৎস থেকে ক্ষমতার মোহনা—যা বলো
সে কেবল ক্ষমতাকে দাপিয়ে বেড়ানো ক্ষমতায়
এত ছোটখাটো কাণ্ডে কেঁদে কেটে মাথা হবে হেঁট ;
চরিত্রই নেই যার তার আবার ধর্ষণ কোথায় ? (চরিত্র)

সকালের খবরের কাগজ কিংবা সান্ধ্য দৈনিক কেড়ে নেয় অনেকখানি সময় খুন আর ধর্ষণের খবরে। আরও আশ্চর্যের, ধর্ষণের মতো কুৎসিত ঘটনাই যথেষ্ট নয়, কাগজে থাকে 'ধর্ষিতার চরিত্র খারাপ ছিল' এ বিষয়ে চমকপ্রদ ইঙ্গিত-বাহী মন্তব্য, কবিতায় যা ধরা পড়েছে এইভাবে—'চরিত্রই নেই যার, তার আবার ধর্ষণ কোথায় ?' খবরের কাগজে পড়া সেই ঘটনার কথা রোজকার জীবনের টানা-পোড়েনের মধ্যে ভুলেই ছিলাম আমরা—তার অনেকদিন পর আলোচ্য কবিতাটি পড়ে ঘটনাটির মধ্যে যে লজ্জা আর মন্তব্যের মধ্যে যে হীনমন্যতার আভাস ছিল—তা উপলব্ধি করলাম নতুনভাবে।

"When the metropolitan lives most keenly, he lives by means of paper"[৩] —সমাজবিজ্ঞানীর এই উক্তি যে আধুনিক নগর জীবনে কি ভীষণ-ভাবে সত্যি—তা আমরা মিলিয়ে নিতে পারি দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে। কাগজের খবর কি অদ্ভুতভাবে উঠে এসেছে আরও অন্য কবিতায়, একেবারে হুবহুভাবে। শঙ্খ ঘোষের নিজের কথায়—'দু-চারটে শব্দ এদিক-ওদিক করে নিলে তো সংবাদই মূলত ছন্দ হয়ে ওঠে, ছন্দে ছন্দে জাগতে থাকে কত চমকপ্রদ সহাবস্থান' ![৪] কবি-

তাটির নাম—'খবর সাতাশে জুলাই',—

পরিচারিকার নিগ্রহ—ও. সি.র স্ত্রী ধৃত
মালদহে দুটি খুন
গর্বাচভকে রেগন দিলেন চিঠি
পারমাণবিক সাহায্য নিয়ে ফ্রান্স-পাক কথা হবে
আফ্রিকাজোড়া বিভীষিকাময় শিশুদের
মূর্খ ভেবে আজ ইনডোরস্টেডিয়ামে
সুপারস্টার
স্টার
সুপারস্টার
ধুম তাতা তাতা থৈ........ (ধুম লেগেছে হৃৎকমলে)

ঠিক এভাবে না হলেও, সংবাদপত্রের অনেক খবর ছবি হয়ে উঠেছে কবিতায়—'লাইনেই ছিলাম বাবা' বইটিতে। মনে আছে, এক সকালবেলা সকালের আলো ম্লান হয়ে এসেছিল এ খবর পড়ে, 'কানপুরে তিন বোন পাখার ব্লেডে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে'। কেন ? না, সামাজিক প্রথা মেনে তাদের বিয়ে দেবার সংগতি বাবার ছিল না, তাই বাবাকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিতে তারা বেছে নিয়েছে এ পথ। সে ঘটনার কথা কি নির্মমভাবে ধরা পড়েছে 'তর্পণ' কবিতায়—

আমরা তিনবোন আজ তোমার মুখের দিকে চেয়ে
চোখের পাথর দেখে বুঝে গেছি জীবনের মানে
হাতে তুলে দিই তাই তিন মুণ্ড যৌতুকের মতো।
আর যারা বর হয়ে দাঁড়াবে এ সামিয়ানা তলে
শেষের তর্পণে এসে নিজে তুমি তাদের হাঁ মুখে,
শরীরের খণ্ডগুলি গুঁজে দিয়ে বোলো—'খা'—'খা'—,
আমাদের কথা ভেবে বিলাপ কোরো না তারও পরে।

আজ এই বিংশশতাব্দীর শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে শিউরে উঠি আমরা—কি হৃদয়-হীন আমাদের সমাজ ! —আর 'নেই' 'নেই' করেও প্রায় মেনে নেওয়া পণের মতো সামাজিক প্রথার কথা ভেবে।

রাজনীতির অদৃশ্য হাত আজ কোথায় না গিয়ে পৌঁছেছে ? আর এই রাজ-নৈতিক ক্ষমতার দণ্ড যার হাতে থাকে, তার ক্ষমতা তো অসীম—'Power corrupts and absolute power corrupts absolutely'—এ কথা আমরা জানি,

যা কবিতার ভাষায় 'ক্ষমতার উৎস থেকে ক্ষমতার মোহনা—যা বলো— / সে কেবল ক্ষমতাকে দাপিয়ে বেড়ানো ক্ষমতায়'। তবে ক্ষমতা যার হাতেই থাক—তার রাস্তা ডানদিকে হোক্ বা বাঁদিকে, সেটা বিবেচ্য নয়—যেটা দেখার তা হলো ক্ষমতাবানের খেলা। ক্ষমতাবান কেবল বিশ্বাস করে নানা উপায়ে তার ক্ষমতাকে প্রদর্শন করতে ; তার জানা নেই উচিত-অনুচিতের সীমারেখা, মানবিকতা এবং ন্যায়-অন্যায় ঃ

'তিন রাউণ্ড গুলি খেলে তেইশজন মরে যায় লোকে এত বজ্জাত হয়েছে
স্কুলের যে ছেলেগুলি চৌকাঠেই ধ্বসে গেল অবশ্যই তারা ছিল সমাজবিরোধী'

এবং

'পুলিশ কখনো কোনো অন্যায় করে না তারা যতক্ষণ আমার পুলিশ।'

(ন্যায়-অন্যায় জানিনে)

সমসময়কে আশ্রয় করে আছে যে কবিতা—তা আমরা পেয়েছি আরও অনেক আগে—'মূর্খে বড়ো সামাজিক নয়', 'বাবরের প্রার্থনা' ও তার পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ-গুলিতে। মনে পড়ছে 'চণ্ডীমঙ্গল' কবিতার কয়েকটি পংক্তি—

আমার কাছে আয়
লাল জুতুয়া পায়ে
ভুলিয়ে দেব কোনটা ন্যায় কোনটা বা অন্যায়। (বন্ধুরা মাতি তরজায়)

যে রাজনীতি বিশ্বাস করে সীমাহীন ক্ষমতায়, তা প্রায় একনায়কতান্ত্রিক—'আমার কাছে না এলে আমার কথা না শুনলে আজ / আমি তো বুঝি না তুমি কিভাবে বা হবে জনগণ।' বা, 'চাবি তো আমারই, আমি যতটুকু চাই ততদূর / সহজেই যেতে পারো—এই স্বাধীনতা—সে তো আছে' (বঁড়শি)। রাজনীতির এই সর্বগ্রাসী প্রবণতার মধ্যে সাধারণ মানুষের 'অধিকার' সীমায়িত হয়ে আসে, 'অধিকার' কবিতায় পাই এই সম্পর্কে শ্লেষ আর ব্যঙ্গে মেশানো কথার ছুরি—

তোমার ডাকে সাড়া না দিলে ভিটেমাটি উচ্ছন্নে দেবে বলে
বোবাচ্চা লোপাট করে দেবে বলে
আমার অধিকার আছে তোমার ভিড়ে লোক বাড়াবার
তোমার জন্যে তুলে না ধরলে কেটে নিতে পারো আমার যে-হাত
আমার অধিকার আছে তোমার জন্যে শুধু তোমারই জন্যে সে-দুহাত তুলে ধরবার
আমার অধিকার আছে
অধিকার আছে

এইসব কবিতা কবির অনুভবে ধরা দিয়েছে সোজাসুজিভাবে—এইসব 'সত্য উচ্চারণ'কে আচ্ছন্ন করেনি কোনো 'মিথ্যা আড়ম্বর'—মুখ নয় 'মুখোস', চারপাশের নানা অন্যায়, হীনতা, নিষ্ঠুরতা আশ্চর্যজনকভাবে উঠে এসেছে এই বইটির কবিতায়—যা পড়তে পড়তে আলোড়িত হয় আমাদের চেতনা, ক্রোধ আর দ্রোহের আঁচে উষ্ণ হয়ে ওঠে আমাদেরও ঢেকে রাখা বিবেক। মনে পড়ে, ২/৩ বছরের বিগত ঘটনাগুলি। এইসব ঘটনাগুলির মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে আমাদের নিষ্ঠুর সমাজের চালচিত্র বা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ; কিন্তু সে সমস্ত ঘটনা কি করে এমন শাণিত উচ্চারণে আশ্রয় করে নিল কবিতার শরীর—এমন প্রশ্নও ভাবায় আমাদের,—আর শঙ্খ ঘোষের কথাতেই পেয়ে যাই তার সমাধানময় উত্তর ঃ 'বাইরের অভিমুখে যে কবিতা—তার মধ্যে কি ভেতরের ক্ষরণ এসে মেশে না অনেক সময়ে ?....অনেক সময়ে কেন, এতটাই বলা যায় যে ভিতরের সেই ক্ষরণ না থাকলে কোনো সময়েই কবিতা কবিতা নয়।[৫] এইভাবেই আমরা দেখেছি—বাইরের পৃথিবীর নানা ঘটনা কি অদ্ভুতভাবে ধরা পড়েছে এই বইয়ের বিভিন্ন কবিতায়। মনে পড়ছে, 'মালা ও পুনম' নামে কবিতাটি। মালা ও পুনম—দুই আশ্চর্য নারী, তাদের চারিত্রিক দৃঢ়তা, শোক অগ্রাহ্য করে বেঁচে থাকার, লড়াই করার মানসিকতাকে আমরা সম্মান জানিয়েছি দূর থেকে। কবিতাটি পড়তে পড়তে আমাদের মনে পড়ে যায় সেই দুই নারীর মুখ....

তোমার স্বাচ্ছন্দ্য দেখি, দূর থেকে।
রঞ্জনেরা খুন হলে তুমি বলো, 'মরেনি ও, আমার ভিতরে বেঁচে আছে
কাজের ভিতরে আছে, ধুলোর ভিতরে, পায়ে পায়ে।'
লোকে বলে এ শুধু প্রতীক ; জীবন জানে নি যারা, তারা বলে।
কখনো দেখেনি তারা মালা বা পুনম ?

আর কবিতাটি শেষও হয় কি অসাধারণভাবে—'তোমার স্বাচ্ছন্দ্য দেখি দূর থেকে/তোমার দর্পও দেখি দূর থেকে/ যে-জল তোমার চোখে ছিল না কখনো/আমি সেই জল ভরে রাখি ঘটে।' অন্য একটি কবিতাও শেষ হয় এরকমই অসামান্য অনুষঙ্গে,—

কোনো মতে ফিরে যাব ফাঁকা টিন বাজিয়ে সহজে—
আগুনই কোথাও নেই—কী হবে বা জ্বালানীর খোঁজে ! (লাইন)

কবিতার এই শেষ পংক্তিদুটি সমাজব্যবস্থার এক সাম্প্রতিক ছবির সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় আমাদের। পরিস্থিতি প্রতি মুহূর্তে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে—একটা পরিবর্তন আসুক। কিন্তু নানা অসঙ্গতি নিয়ে সমাজ আবর্তিত

হয় প্রচলিত পথেই। ....'এ এক আশ্চর্য সময় যখন আশ্চর্য বলে কোনো কিছু থাকে না। এক স্থির দুঃসময় এসে হাজির হয় মানুষের সামনে যখন পরিত্রাণ কোনোদিকে শেকড় মেলে না। ....বাইরের আবহ বিচলিত হয় ক্রোধে, তপ্ত হয়ে ওঠে বিক্ষোভে, আন্দোলিত হয় অস্থিরতায়। ....এক অশুভ দুর্দিনের সাক্ষ্যে নির্দ্বিধায় শঙ্খ ঘোষের কবিতা তেতে ওঠে, বাইরের আঁচে, সর্বনাশা অভিশপ্ত সময়ের আগুনে। ....তীব্র সময়-সমীক্ষা স্বাক্ষরিত হয় তাঁর রচনায়'।[৬]

হিমালয়ে গেঁথে থাকে তিনখণ্ড ত্রিশূলের মুখ
শামুক শামুক শুধু দেশজোড়া শামুক শামুক
উৎস থেকে মোহনায় ছুটে যায় ঘোলা জল আবর্ত তুফান
শকুনি-আহ্লাদে ফাটে কান
ইয়ে তো পহেলা ঝাঁকি হ্যায়
ইয়ে তো পহেলা ঝাঁকি হ্যায় (স্বপ্ন)

'ইয়ে তো পহেলা ঝাঁকি হ্যায়'—জনৈক জননেতার এই উক্তির অনুষঙ্গে মনে পড়ে যায় সেই কালো দিনগুলোর কথা। কালো দিন? হ্যাঁ, মাত্র তো বছর দেড়েক আগেকার ঘটনা। সুস্থিতিহীন আমাদের জীবনে ১৯৯২ এর ৬ই ডিসেম্বর নিয়ে এসেছিল সত্যিকারের সংকট ও শঙ্কা। ধর্ম ও রাজনীতির টানা-পোড়েনে মন্দির-মসজিদ ইস্যু নিয়ে শুরু হয়েছিল অযোধ্যাকাণ্ড—তার সূত্র ধরে দেশজোড়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ঘটনার আকস্মিকতা স্তব্ধ করে দেয় আমাদের। সারা শহর মুখ লুকিয়েছে যখন-তখন জারি করা কারফ্যুর শাসনে। রাস্তাঘাট শুনশান, দোকানপাট বন্ধ, কেবল বেতার-দূরদর্শন জানিয়ে দিচ্ছে—কোথায় কোথায় জ্বলছে আগুন, পুড়ছে কতো বস্তি, ঘরছাড়া হয়েছে কতো মানুষ। একবিংশ শতাব্দীর দরজায় দাঁড়িয়ে আমরাও কি সেদিন অবাক হয়ে ভাবি নি—এ কোন্ ভারতবর্ষের ছবি? শঙ্খ ঘোষের কবিতায় যা উঠে এসেছে এইভাবে—'হাওয়ায় হাওয়ায় ঝাঁকি অক্ষরে অক্ষরে জাগুয়ার/স্বপ্নের ভারতবর্ষ স্বপ্নের ভিতরে অন্য কার।' (স্বপ্ন)

বাইশটি কবিতা নিয়ে মাত্র বত্রিশ পাতার এই কবিতা-বইটি যেন বারুদে ঠাসা, আর 'আসির চাইতে' যে 'ধারালো মসী'—এ কথাটা আবার মনে হয়। সমকালীন রাজনীতির এই 'ঘোলা জলের আবর্তে' আমরা যারা দিশেহারা, তাদের কাছে আরও একটি প্রশ্ন মাঝে মাঝে ধাক্কা দেয়—'তুমি কোন দলে'? বেঁচে থাকতে গেলে চাই দলীয় রাজনীতির প্রতি আকণ্ঠ আনুগত্য, তাই—

'কী কাজ কী কথা সেটা তত বড়ো কথা নয় আগে বলো তুমি কোন্ দল'।

কি পরিচয়ে ব্যক্তি পরিচিত হবে সমাজে? দলচিহ্নিত হয়ে? এই জিজ্ঞাসাতাড়িত কবি সংগতভাবেই ব্যবহার করেন কবিতার শিরোনাম 'তুমি কোন দলে?' এরপর সমগ্র কবিতাটিতে 'তুমি কোন্ দল' বা 'তুমি কোন্ দলে' বাক্যটির বারংবার প্রয়োগে যে অভিঘাত তৈরি হয় তা অন্তর্নিহিত অর্থের দিক থেকে অনিবার্য হয়ে ওঠে কবিতার শরীরে, আর শ্লেষে-মেশা এক ঝক্‌ঝকে ইস্পাতের ফলা হয়ে ওঠে বাক্যবন্ধটি 'তুমি কোন দলে?' দল-চিহ্নিত মানুষের এ-পরিচয় আচ্ছন্ন করতে পারে ব্যক্তিগত সম্পর্ককেও—

'রাতে ঘুমোবার আগে ভালবাসবার আগে প্রশ্ন করো কোন্ দল তুমি কোন্ দল।'
(তুমি কোন্ দলে)

শঙ্খ ঘোষের কবিতায় সমসময়ের যে ছবি আমার আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলিতে প্রত্যক্ষ করলাম—তা কিন্তু কোনো ব্যতিক্রমী উদাহরণ নয়। সমাজে রোজ রোজ ঘটে যাওয়া অন্যায়, প্রশাসনিক ত্রুটি-বিচ্যুতি, অমানবিক সব কার্যকলাপ এ গ্রন্থের কবিতায় হাজির হয়েছে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ আর তির্যকের চাবুকের আঘাতে— প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে কবি যেন সচেতন করে দিতে চেয়েছেন আমাদের এই সময়ের সংকট সম্পর্কে। 'লাইনেই ছিলাম বাবা'র ঠিক একবছর পরে প্রকাশিত হয়েছে 'গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ'—শিরোনামহীন ৩৬টি কবিতা নিয়ে এই বইটি। এখানেও শঙ্খ বলেছেন বিপন্নতার কথা, সংকটের কথা—এই গ্রন্থের কবিতাতেও পাওয়া যাচ্ছে কবির সমমানসিকতাকে—তবে এই কবিতার কণ্ঠস্বর আলাদা—

সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে যতটুকু শব্দ, তারও চেয়ে
সামান্য ধুনন তুলে চলে গেল দিন, আমি দেখি।
কালো তুষারের ঝড়, উপসাগরের নষ্ট জল,
হাজার বছর শেষে ডাঙায় তাড়ানো জলচর,
পিছল মাটির স্তূপে ঠোঁট থুঁড়ে মরে যাওয়া, আর
সব ভুলে ধোঁয়ামাখা ঘুমিয়ে পড়া এ জনপথে
বুকের উপর দিয়ে গলে যাওয়া শব্দহীন দিন। (১৬ / গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ)

সমুদ্রের জল তেলে মেশা আর আগুন জ্বলছে—সেই বীভৎসতায় আহত, ক্লান্ত সমুদ্র-জলচর উঠে এসেছে তীরে—মনে পড়ে যায় আবশ্যিকভাবেই উপসাগরীয় যুদ্ধের কথা। দেশের ভেতরে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ধর্মের জন্যে দাঙ্গা বাধে, আর তেলের জন্যে যুদ্ধমান দুই দেশ। তাই সংকট শুধু দেশাভিত্তিক নয়—আজ সারা পৃথিবী জুড়েই এক দৃশ্য—একধরনের সংকট আর বিপন্নতা। এসব নিয়েই আমাদের বেঁচে থাকা—"সব ভুলে ধোঁয়ামাখা ঘুমিয়ে পড়া এ জনপথে /

বুকের উপর দিয়ে গলে যাওয়া শব্দহীন দিন"(১৬)। বাইরের পৃথিবীর ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত যেমন ভাবায় কবিকে, তেমন আবার কখনও কখনও আত্মিক টানা-পোড়েনও শব্দময় হয়ে ওঠে কবিতায়; তাই কোনো কবিতা ধরে রাখে আত্ম-অনুশোচনার কথাকে—

সব ভুল জড়ো করে জ্বালিয়ে দিয়েছ শুকনো পাতা
সে-দাহনে জেগে ওঠে জ্ঞান, ওঠে, লাফ দিয়ে ওঠে
সোনালি চিতার মতো, আর তার থাবা বুকে নিয়ে
বালির ভিতরে খুব ছোটো ছোটো পায়ে যেতে যেতে
অবশ শরীর ছুঁয়ে উড়ে যায় সমুদ্রের হাওয়া—
জীবনে বয়েস নয়, বয়সে জীবন জুড়ে যাওয়া।(১৪)

নিজেই প্রশ্ন রেখেছিলেন কবি—"কী নিয়ে লেখা হবে কবিতা? আমার বাইরের পৃথিবী নিয়ে? না কি আমারই ব্যক্তিগত জগৎ নিয়ে?.....কিন্তু এই দুই কি ভিন্ন নাকি? এই দুয়ের মধ্যে নিরন্তর যাওয়া-আসা করেই কি বেঁচে নেই মানুষ"?[৭] বাইরের পৃথিবী আর ব্যক্তিগত জগৎ—এই দুয়ের মধ্যে নিরন্তর যাওয়া-আসা করে শঙ্খ ঘোষের কবিতা। ব্যক্তিগত জগতের মূল বিন্দুতে থাকে ব্যক্তি স্বয়ং—নিজের বৃত্তে সুখী—বাইরে টানটান, কেতাদুরস্ত এই মানুষের পরিচয় কি একটাই? এই সুখ আর আত্মতৃপ্তির আড়ালে কি লুকিয়ে থাকে না হাজারটা অতৃপ্তি, অ-সুখ আর আত্মিক বিপন্নতা? আসলে আপাতসুখী মানুষের ভেতরে থাকে আরেকটা মানুষ—যে চারদিকের বিপন্নতায়, সংকটে কুঁকড়ে পায়—জীবনের জটিল গ্রন্থিগুলো পাকে পাকে খুলে দেখতে চায় আর সেইসব অস্থিরতার কথা মানুষ কখনও বলে ওঠে নিজেরই দ্বিতীয় সত্তাকে—'তবে কি তোমাকে কাল আহত করেছি ভুল করে? / কথা যদি আজ আর কোনো কথা না বলে কখনো / মুখোমুখি কথামালা আমাদের কতদূরে নেবে? / টোকা দিয়ে দেখি তাই কী বলে সে, কিছু কি বলেছে? / বেঁচে আছে? মরে গেছে? বাঁচামরা এক হয়ে আছে।'(১২) বেঁচে থাকা হয়তো, এ সময়ে, এক হিসেবে কঠিন—তাই জীবন আর মৃত্যুর সীমানা এক হয়ে যায়, সমস্যাদীর্ণ জীবনের মুখে আশার আলো ফিকে হয়ে আসে। এ সময়ে শিকড়হীন মানুষ অনিকেত, মানুষে-মানুষে সংযোগের সেতুও মজবুত নয়।—"লোকেরা যে বলে / 'আচ্ছা চলি, দেখা হবে'—কোনখানে দেখা হতে পারে? / কোথাও ঠিকানা আছে? কোনো অভিজ্ঞান?" আশাবাদী কবির মন শঙ্কিত হয়ে ওঠে—

কাঁভাবে বলবে তবে উঠে এসো গান গাও বাঁচো
গন্ধর্ব তুমিও যদি মাথা নিচু করে বসে আছো!(১২)

সংখ্যা-চিহ্নিত এই কবিতাগুলি পড়তে পড়তে মনে হয়েছে যেন এগুলির ভেতরে ভেতরে বয়ে যাচ্ছে একটাই ধারা—'প্রবল স্রোতের মতো টানে লেখা কোনো এক দীর্ঘ কবিতা'। —কবি এ সম্পর্কে গ্রন্থের সূচনাকথা'য় জানিয়েছেনও—'কয়েক বছর আগে, বেশ কয়েকটা মাস কেটেছিল শিমলার এক পাহাড়-চুড়োয়। মেঘকুয়াশায় চরাচর-ঢেকে-দেওয়া সেখানকার এক সকালবেলায় অনেকদিন পর একেবারে একঝোঁকে লেখা হয়ে গেল কয়েকটি কবিতা। পরে মনে হলো, হয়তো ঠিক 'কয়েকটি' নয় তারা, একটিই মাত্র লেখা, কেবল স্তরে স্তরে খোলা"। শিরোনামহীন কবিতাগুচ্ছের একাধিক কবিতায় পাই 'গন্ধর্ব' সম্বোধন—তবে না, কোনো দেবত্ব বা অতিমানবিক মহিমা আরোপিত হয় নি 'গন্ধর্ব'-এর ওপর—"গন্ধর্ব তুমিও আছো আমার এ শস্যসীমানাতে / যেখানে পাহাড় এসে পাহাড়তলিতে মিশে গেছে /আকাশ তোমার মুখ, মাটিছোঁয়া প্রতিমুহূর্তেই"।(১৩) কবিতায় 'গন্ধর্ব'কে আমরা দেখি ভিখিরির মতো অন্ধ গলিতে রকের পাশে একাকী বসে—আবার কখনও বৃষ্টির দিনে চায়ের দোকানে—তার চোখের কোণে দাগ। 'গন্ধর্ব'র সঙ্গে কবি কথা বলেন অন্তরঙ্গতায়—

'তোমারও কি স্বর ভাঙা? তবে আর কার কাছে যাব!
তোমার ধৈবতে আজ নিজেকে লাঘব করে নিয়ে
দু-একটি কথা শুধু বলে যাব সোজাসুজি চোখে
ভেবেছি কত-না দিন জপেছি কত-না দিনরাত।'(১০)

যে কোনো অবস্থায় কবি চান গন্ধর্বের সঙ্গ, তাই অকপটে বলে ওঠেন—

'ব্যভিচারী তুমি, তুমি যেখানেই যাও আমি যাব
আমারই পাঁজর ভেঙে যদি শুধু মশাল জ্বালাও
আমার করোটি নিয়ে ধুনুচি নাচাতে চাও যদি,
তবু আমি কোনোদিন ছেড়ে যেতে দেব না তোমাকে'।(১৮)

কখনও আবার সাধারণ মানুষের মতো অনুযোগ-ও রাখেন গন্ধর্বের কাছে—"খোঁড়া পায়ে এতদূর এসেছি কি কিছু না পেয়েই / ফিরে যাব ভেবে? শোনো, তোমার চাতুরী আমি বুঝি। / হাতেরও আঙুল নেই তবুও প্রথম থেকে ফের / বানাব ছবি ও গান, ছড়াব উজাড় কথামালা"।(১৮)

'স্ফটিক সময় হাতে হিমাচলে মেহমান' কবি প্রতিটি সময়ে—খণ্ড মুহূর্তে অনুভব করেছেন গন্ধর্বের অস্তিত্ব—"তুমি শূন্যের ভিতরে ওই বিষণ্ণ প্রতিভাকণা নিয়ে / আমার মুখের দিকে চেয়ে আছো বিষম পাহাড়ে"। আর তাই, "গন্ধর্ব,

তোমার হাত ছুঁয়ে / এই শিলাগুল্ম চিরজাগরূক বোধ নিয়ে আসে"। 'গন্ধর্ব' সম্বোধনে লেখা এই কবিতাগুলি পড়তে পড়তে মনে পড়ে যায় অন্য একটি কবিতা-বইয়ের কথা। ক্ষমা করবেন, পাঠক, যদি লঙ্ঘিত হয়ে যায় সৌজন্যের মাত্রা—তবু বলছি 'গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছে' পড়তে গিয়ে স্মৃতিতে বারবার ভেসে উঠেছে ভাস্কর চক্রবর্তী'র 'দেবতার সঙ্গে' নামের কৃশ কাব্যগ্রন্থটির কথা। দ্বিতীয় বইটিতে কবি 'গন্ধর্বের' মতোই 'দেবতা'কে জানিয়েছেন তাঁর নিজের বিপন্নতা, নিরাপত্তাহীনতা এবং পরিপার্শ্বের ও সময়ের সংকটের কথা, সমস্যার বিষয়—এমনই আত্মমগ্ন আন্তরিক নিচুস্বরে; তাই দু'জনের বাচনভঙ্গির মধ্যে পেয়েছি অদ্ভুত সাদৃশ্য। দুটি বইয়ের কয়েকটি কবিতার পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করছি :—

গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছে

গন্ধর্ব, উন্মাদ, তুমি অর্থহীন হাতে উঠে এসে / জলমণ্ডলের ছায়া মাখিয়ে গিয়েছ এই মুখে (১)

গন্ধর্ব, যেখানে তুমি দাঁড়িয়েছ তার ঘন নিচে / সবুজ ভাণ্ডের ওই বর্তুল গহ্বর থেকে আজ / মানুষের স্তব ওঠে, হলাহলও ওঠে মাঝে মাঝে (২)

গন্ধর্ব, বিশ্বাস রাখো, আমরাও জেনেছি শরীর / এইখানে শুয়ে আজ মাটির উপরে কান পেতে / কে পে ওঠা তার সব দেশজোড়া ধ্বনি ছুঁতে পাব (৫)

তুমি ঘুম ছুঁয়ে আছো ঠোঁটের দুকোণে ভাঙা হাসি / তারই আভা উঠে এই আহত দু'চোখ শুশ্রূষায় / ধুয়ে দেয়, আমি আজ আর কোনো দুঃখ বুনব না (৮)

গন্ধর্ব, সেদিন খুব মাথা নিচু করে বসেছিলে / ভিখিরির মতো অন্ধ গলিতে রকের পাশে একা। / তোমারও কি স্বর ভাঙা ? (১০)

সেদিনও তোমার সঙ্গে দেখা হলো গলির বাঁ-পাশে। / ভালোই তো আছো মনে হলো (১৫)

শোনো, তোমার চাতুরী আমি বুঝি। / হাতেরও আঙুল নেই তবুও প্রথম থেকে ফের / বানাব ছবি ও গান, ছড়াব উজাড় কথামালা (১৮)

গন্ধর্ব, তোমার কাছে কত-যে শিখেছি এ-জীবনে ! (২০)

আমার গরিবজন্ম তোমাকেও করেছে গরিব / এবার বৃষ্টির দিনে বসে আছো চায়ের দোকানে (২৯)

গন্ধর্ব তুমিও আছো আমার এ শস্যসীমানাতে
যেখানে পাহাড় এসে পাহাড়তলিতে মিশে গেছে
আকাশ তোমার মুখ, মাটিছোঁয়া প্রতিমুহূর্তেই ৩৩

আজ সব ছেড়ে এসে দেখি তুমি বাঁকানো খিলানে / কাচে ঢাকা ন্যূমি হয়ে শুয়ে আছো ছায়াজাদুঘরে— / এবারের মতো আর ছুঁয়ে দেখা হলো না তোমাকে। ১৫

দেবতার সঙ্গে

দেবতা আমাকে ফেলে সন্ধেবেলার ট্রেনে দেরাদুন গ্যাছেন। / আমি একা ছোটো ঘরে থাকি—ফলে আলো / পড়ে না শরীরে, মনে— ২

আমার গলির মধ্যে কোনো গাড়ি ঢোকে না দেবতা ৬

এবার ঘরের মধ্যে এ দেবতা আকাশ জেগেছে / ছবিগুলো ফুটে ওঠে পরিষ্কার এ কোন্ ক্যামেরা ? ৭

তুমি কি বাতাস আজ পাঠালে আমার জন্যে এপ্রিলের রাতে ? ১০

আমাকে ছুঁয়েছো তাই শ্বেতপাথরের মতো শান্ত হয়ে আছি। / কোথায় যে ছিলে তুমি / আমার অনেক দিনরাত শুধু পণ্ডশ্রমে গ্যালো। ১১

হয়তো বিদেশে ছিলে তুমি তাই কালরাতে ঘুমোতে পারি নি। ১২

ছড়াও তোমার ডানা আমি মুগ্ধচোখে দেখি তোমার বিস্তার / শোনাও তোমার গান আমি ছবি আঁকতে চাই শুধু ১৫

যদি না তোমার সঙ্গে কথা তবে রাত্রিবেলা ছাদে কেন বসে থাকি একা ? ১৭

কেন তুমি মুখোশ দাও নি ? / কেন পরচুলের আদরে তুমি রাখো নি আমাকে ? ২১
হৃদয় বাতাসছোঁয়া হৃদয় মানুষছোঁয়া—বৃষ্টি ভেজা মুখ ৪

ছেড়েছো আমার সঙ্গ আজকাল—তবু তবু তবুও বিষণ্ণ নই আমি—
অন্ধকার গর্তে আজো পড়ে যাই—সাবধান করি সঙ্গীদের
একদিন আনন্দের দিন তারা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাবে—
পুরোনো কেল্লার পাশে ব'সে
আমিও আমার কাজ করে যাবো—তারপর মুছে দিয়ে যাবো এই নাম। ২৩

দেবতা, কিশোর তুমি, তোমাকে দেখাশোনার ভার.... ১৩

এইভাবে কবি ও গন্ধর্বের মধ্যে অন্তরঙ্গ কথাবার্তা এবং কবি ও দেবতার মধ্যে

আন্তরিক কথাবার্তায় দেখতে পেয়েছি আশ্চর্য মিল। তবে দু'কবির কাব্যভাষা একেবারেই আলাদা ; স্বতন্ত্র দু'জনের কবিতায় চিত্রকল্প ব্যবহারের দক্ষতা। আলোচনার কম্পাসকে আবার ঘোরানো যাক। শঙ্খ ঘোষের আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতাটিই পাঠক হিসেবে আমাদের মনোযোগ কেড়ে নেয়—

তবু আজও বৃষ্টিহারা হয়ে আছে সমস্ত প্রবেশ
আমারও পায়ের কাছে চাপ চাপ রক্ত লেগে আছে।
আমি সর্বনাশ দিয়ে সর্বনাশ বাঁচাতে গিয়েছি
হাত ছুঁতে গিয়ে শুধু আগুন ছুঁয়েছি....(১)

এখানেই লক্ষ করি আত্মমুখী, আত্মমগ্ন এসব কবিতার মধ্যে কিভাবে জড়িয়ে রয়েছে বাইরের জগৎ, জীবন ও মানুষ সম্পর্কে কবির ভালবাসা ও ভাবনা। পরিপার্শ্ব ও মানুষজন সম্বন্ধে এই সদর্থকবোধ কবিকে করে তুলেছে মানুষের প্রতি আরও বেশি বিশ্বস্ত, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে আরও বেশি সংবেদনশীল—

কে বলে বিচ্ছেদ তবে ? ঘাসের রোমাঞ্চ ধমনীতে—
শূন্য মাটি সপ্ততল একসূত্রে বেঁধেছি এ-বুকে।'(২)

কোনও সংকট, কিংবা সমস্যার আবর্ত কবিকে টেনে নেয় না কোনও বিশ্বাস-হীনতার ভূমিতে, তাই তো গন্ধর্বকে বলতে পারেন—

গন্ধর্ব, বিশ্বাস রাখো, আমরাও জেনেছি শরীর
এইখানে শুয়ে আজ মাটির উপরে কান পেতে
কেঁপে ওঠা তার সব দেশজোড়া ধ্বনি ছুঁতে পাব
সমস্ত ফাটল ঠিকই ভরে দেব জাতকের বাঁজে।(৩)

সময় নিয়ত পরিবর্তনশীল, কখনও থামে না, কোথাও থামতে জানে না। তাই 'সাগর ভেঙে যেমনভাবে জেগে ওঠে আগুন পাহাড়'—তেমনি 'এক দশকের থেকে আরেক দশক উঠে আসে'—শতাব্দী শেষের সময়-সমুদ্রের পাড়ে বসে আত্মবিশ্লেষণ করলে, পেছন ফিরে তাকালে হয়তো বোঝা যায় ভুলে-ভরা জীবন যাপন, বোঝা যায় সাফল্যের আকাঙ্ক্ষা কতো ক্ষতিকর। সফলতার তাড়নায় একজন মানুষ আরেকজনকে আহত করতেও দ্বিধাগ্রস্থ হয় না। এই বোধ কবির অনুভবে ধরা দিয়েছে এইভাবে—'পাড়ে এসে বুঝি,/গন্ধর্ব, তোমার কাছে কত-যে শিখেছি এ-জীবনে !/বালির পুতুলগুলি কখন রোবট হয়ে ওঠে / বুকে এসে থাবা মারে, হৃৎপিণ্ড খুলে নেয়, বুঝি/সাফল্যের চেয়ে আরো বড়ো কোনো বিকার ছিল না।' মানুষে-মানুষে সংযোগহীনতা, পরিপার্শ্বে বিপন্নতা শঙ্কিত করে কবিকে, কবির

আক্ষেপ উচ্চারণময় হয়ে ওঠে কবিতার ভাষায়—'আমার কাজই হলো ধ্বংসাবশেষের শ্বাস শোনা।' কিন্তু ধ্বংসেই তো শেষ কথা নয়, তাই ধ্বংসাবশেষের শ্বাস শুনতে শুনতে কবি কান পেতে থাকেন নতুন সৃষ্টি, নতুন প্রাণের স্পন্দনের দিকে—

আমারই ছোঁয়ার নিচে বর্তুলে-গহ্বরে এ পাহাড়
নগ্ন হয়ে শুয়ে আছে নতুন জন্মের প্রতীক্ষায়—
পরাগ, পায়ের কাছে পথে পথে মৃত্যুর পরাগ।(৭)

জীবনের দিকে এই যে আশ্বাসময় দৃষ্টি, একে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি শঙ্খ ঘোষের অন্য কবিতাতেও। তবে শুধু সময়, মানুষ বা জীবন-অন্বিত চেতনা নয়, 'দেশ-ভাবনা'ও শঙ্খের কবিতায় অধিকার করে আছে অনেকখানি জায়গা। "এ সময়ের প্রধান ভর হয়ে থাকে তাঁর কবিতায় দেশ-ভাবনা। সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁর কবিতায় বারবার দুলে ওঠে। গদ্যে-পদ্যে সর্বত্রই ফুটে ওঠে একজন ভারতীয়ের মুখ"—শঙ্খ ঘোষের কবিতা-আলোচনায় এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন এক কবি।(৮) এই মন্তব্যের সূত্র ধরেই ২৫-সংখ্যক কবিতাটির কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি—

'একদিন এই দেশে—সুজলা সুফলা এই দেশে
পাথরে পাথর গেঁথে উঁচু করে বানাব মিনার
সেখানে দাঁড়িয়ে যারা ছিন্নভিন্ন পক্ষাঘাত থেকে
চন্দ্রগিরিমার দিকে বাড়াবে অশোক হাতগুলি
তারা কেউ এরা নয়—হিন্দুও না, মুসলমানও নয়,
জৈন বৌদ্ধ খ্রিষ্টানও না, জরথুস্ট্রি নয়, কিন্তু সবই
একাকার কোনো দীন ইলাহির গোলাপবাগানে।'

এই দেশ, ভারতবর্ষ, যেখানে আজ অতীত ঐতিহ্য ও গৌরব ভুলে গিয়ে মুষ্টি-মেয় মানুষ মেতে ওঠে ধর্ম ও রাজনীতির খেলায়—ধর্মের জিগির তুলে বাধায় দাঙ্গা—সেই দেশেই শঙ্খ দেখতে চান এক নির্মাণের স্বপ্ন। সেদিন থাকবে না ধর্মের জন্যে হিংসা, ধর্মের জন্যে হানাহানি ও রক্তপাত—সেদিন সমস্ত দেশ ভরে যাবে এক শুভ-চেতনার আলোতে, স্বপ্নদ্রষ্টার অনুপস্থিতিতেই হয়তো বা—সেই মন্ময় ভাবনা ধরা পড়েছে কবিতায়—

'তখন কোথায় আমি, কোথায়-বা ক্ষত্রবংশী তুমি
মানুষই তখন গান, মানুষ তখনই ধ্রুবাদর।'(২৫)

আজকের এই তীব্র বাণিজ্যনির্ভর পৃথিবীতে, এই 'ফ্লুরোসেণ্ট সাজানো'

সমাজে আমাদের জীবন বসে আছে ধ্বস্ত মূল্যবোধ, নীতিহীনতা আর বিশ্বাসহীনতার ভূমিতে—মানুষে-মানুষে সংযোগ শিথিল, ভালবাসা উধাও। তবু এই বিপন্ন সংকটময় সময় যেন চিরায়ত না হয়—এক সুন্দর নির্মাণের স্বপ্ন নিয়ে কবি অনুভব করেন—'আজ সবই ভুলে যাওয়া, আজ ধানশিষে লাগে হাওয়া / বহু বিফলতা আজ এনেছে তোমার কাছাকাছি ৩৫ ; তাই আবার নতুন আশ্বাসে ডাক দেন গন্ধর্বকে—

'গন্ধর্ব, আমরা আজ সমস্ত উড়িয়ে এসো বাঁচি'। ৩৫

এই অসম্ভব জীবনমুখী সদর্থক ভাবনা আমাদেরও আশাবাদী করে তোলে—শঙ্খ ঘোষের কবিতার সার্থকতা এখানেই। মৃত্যুর হিমশীতল সীমানা নয়, জীবনের ব্যাপ্ত পরিধির দিকে মুখ ফেরানো শঙ্খ ঘোষের কবিতা, বিশ্বাস আর ভালবাসার প্রান্ত ছুঁয়ে শঙ্খ ঘোষের কবিতা—তাঁর কবিতায় মানুষ পায় মানবিকতার উষ্ণ স্রোত। 'গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছে'র পংক্তিতে পংক্তিতে লগ্ন হয়ে আছে এই মানবিক চেতনার স্রোত—জীবনের প্রতি বিশ্বাস আর ভালবাসার কথা—এই কবিতাগুচ্ছ মানুষের স্তবগাথা এবং একথাও নির্দ্বিধায় বলা যায়, এ কবিতা শুধু সমকালের নয়, উত্তরকালেরও।

পরিশেষে, মনে পড়ছে এক কবির কথা, যিনি একটি পত্রিকায় লিখেছিলেন.... 'শঙ্খবাবুদের এখন যাবার সময়, ফেয়ারওয়েল ডিনারের ব্যবস্থা করতে হবে'। ৯ সমাজমনস্ক ও সময়সচেতন কবি শঙ্খ ঘোষের সাম্প্রতিক কবিতা বই দুটি পাঠের পর আমাদের মতো সাধারণ কবিতা পাঠকরা এমনতর মন্তব্যে বিস্মিত না হয়ে পারি না। 'অমুক বাবুকে তমুক সাগরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া উচিত'—রাজনৈতিক নেতাদের মতো এই ধরনের হঠকারী মন্তব্য আমাদের সামান্যমাত্রও বিচলিত করে না, বরং অভ্যস্ত গ্রাহ্যতায় আমরা মেনে নিই ওই ফাঁকা বক্তব্যের অর্থহীন আওয়াজ।

১. লাইনেই ছিলাম বাবা—শঙ্খ ঘোষ
২. গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ—শঙ্খ ঘোষ

উৎস-সংকেত ঃ

১) সাক্ষাৎকার, শঙ্খ ঘোষ, পিলসুজ ২৩, অক্টোবর '৮৯
২) শঙ্খ ঘোষ, কবিতা আর তাঁর পাঠক, নিঃশব্দের তর্জনী
৩) লুই মামফোর্ড, দ্য কালচার অফ সিটিস
৪) শঙ্খ ঘোষ, কবিতার মুহূর্ত, ২৪
৫) শঙ্খ ঘোষ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, জার্নাল

৬) সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, 'আমার শব্দহীন স্তব' ঃ শঙ্খ ঘোষের কবিতা, প্রসঙ্গত কবিতা
৭) শঙ্খ ঘোষ, পা তোলা পা ফেলা, কবিতার মুহূর্ত
৮) দুর্গা দত্ত, নির্বাক মুখ, সবাক চোখ, অনুষ্টুপ, শঙ্খ ঘোষ সংখ্যা (১৯৯৪)
৯) সুবোধ সরকার, কবিতা পাক্ষিক, ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪

কবিতাপাঠককে কবিতাসম্পর্কিত কয়েকটি উদ্যত প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেবার মত প্রবন্ধ-সংকলন

প্রতীক্ষিত বর্ণমালা

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশক অন্তরীপ
৫ খেলাত বাবু লেন টালা পার্ক কলকাতা ৩৭
পরিবেষক পাতিরাম দাম কুড়ি টাকা

নতুন কবিতার বই

খরা উর্বরায় চিহ্ন দিয়ে চলি	অরুণ মিত্র	প্রতিক্ষণ
কবিতা সংগ্রহ ১৯৪৯-৯৪	মণীন্দ্র গুপ্ত	পরমা
গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ	শঙ্খ ঘোষ	প্রমা
নদী ও রাত্রি বন্টন হয়ে গেলে	অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত	প্রমা
বাধা পেরোনোর গান	প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত	আনন্দধারা
স্বপ্ন দেখার মহড়া	ভাস্কর চক্রবর্তী	আনন্দ
বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বঙ্গইতিহাস	গীতা চট্টোপাধ্যায়	ঋক
টক আঙুরের কথা	রমা ঘোষ	বিষবিদ্যা
নির্বাচিত কবিতা	রণজিৎ দাশ	ভস্তক
রূপকথার নিষ্ঠুরতা	তুষার চৌধুরী	দে'জ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
সভাপতি

বাদল বসু
সহ-সভাপতি

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
সম্পাদক

আত্মীয়সভা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন ধারা অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত। নং এস ৬৯৭০৪

লেখক, শিল্পী ও কবিদের শুভার্থী সংস্থা আত্মীয়সভা বেশ কিছুদিন ধরে কাজ আরম্ভ করেছে। সৃষ্টিশীল অনেক পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের নিজস্ব সংস্থা আছে, যেগুলি ঐসব পেশার কোন সদস্য বিপদে পড়লে বা অন্য কোন প্রয়োজনে তার পাশে দাঁড়াতে পারে। লেখক কবি ও শিল্পী-দের জন্য এ ধরনের একটি সংস্থার প্রয়োজন ছিল বহুদিন আগে। আত্মীয়সভাকে গড়ে তোলার পেছনে এই অভাববোধই প্রধান প্রেরণা। সামাজিক দায়িত্বের কথা স্মরণ করে সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে, লেখক, শিল্পী ও কবিদের পাশে দাঁড়ানো ছাড়াও, এই সংস্থা কবি ও লেখকদের সঙ্গে পাঠক, শিল্পীর সঙ্গে দর্শকের আরো সুদৃঢ় মেলবন্ধনের চেষ্টা করছে। আত্মীয়সভার কর্মসূচীতে আছে ঃ

(ক) অসুস্থ লেখক, কবি ও শিল্পীদের প্রয়োজনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

(খ) বয়স্ক ও সহায় সম্বলহীন লেখক ও শিল্পীদের মাসোহারা প্রদানের চেষ্টা।

(গ) গ্রাম ও জেলার লেখক ও শিল্পীদের চিকিৎসা ও অন্যান্য জরুরী প্রয়োজনে কলকাতায় কম খরচে থাকার জন্য অতিথি নিবাসের ব্যবস্থা করা।

(ঘ) কলকাতার বাইরে কোথাও লেখক ও শিল্পীদের জন্য হলিডে হোম ও বৃদ্ধাশ্রম নির্মাণ।

(ঙ) তরুণ লেখক, কবি ও শিল্পীদের প্রতিভার যথাযথ বিকাশের প্রয়োজনে সাহায্য করা।

(চ) যথার্থ গুণী ও প্রতিভাবান লেখক-শিল্পীদের সংবর্ধনা।

যদিও আত্মীয়সভার কর্মসূচী খুব ব্যাপক নয়, প্রয়োজনের বিচারে এগুলি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। আত্মীয়সভার সাধ অনেক, সাধ্য সীমিত। একটি সুস্থ এবং পরিকল্পিত কর্মসূচীর মাধ্যমে আত্মীয়সভার কাজ আমরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। ইতিমধ্যে এই সংস্থা ন'জন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও শিল্পীর চিকিৎসা ও অন্যান্য প্রয়োজনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

লেখক ও কবির পরম আত্মীয় পাঠক। শিল্পীর ক্ষেত্রে দর্শক। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্যের সব পাঠক ও শিল্পরসিক দর্শক এবং সকল শ্রেণীর সহৃদয় ব্যক্তির কাছে আত্মীয়সভার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয় অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য করার জন্য আবেদন রাখছি। সাহায্যের জন্য প্রদেয় অর্থ 'অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেক' বা 'ডিমাণ্ড ড্রাফটে' আত্মীয়সভার নামে পাঠালে ভাল হয়। অন্যথায় মানি অর্ডারেও পাঠানো যেতে পারে। আমাদের বিশ্বাস আত্মীয়সভার কর্মসূচীর সফল রূপায়ণে পরিচিত ও অপরিচিত সকলের অনুগ্রহ ও সহযোগিতা চিরদিন পাথেয় হবে।

সাহায্য পাঠাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনে যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

ধূর্জটি চন্দ
স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিসিটি সোসাইটি
৭/১সি, লিণ্ডসে স্ট্রীট (দোতলা)
কলকাতা-৭০০ ০৮৭
ফোন ঃ ২৪৫-১৭৪১